ভারতীয় জনতা পার্টি

পশ্চিমবঙ্গ

পণ্ডিত দীনদয়াল উপ্যাধ্যায় প্রশিক্ষণ মহা অভিযান

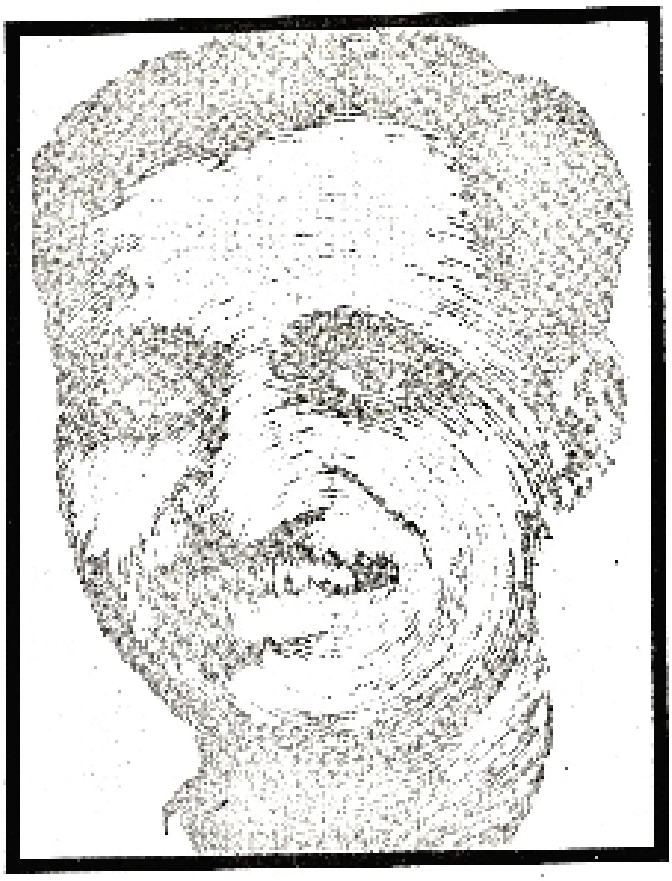

৬ মুরলী ধর সেন লেন
কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

প্রশিক্ষণের বিষয়

১. মণ্ডল স্তরে বর্গের বিষয় ঃ

বি জে পি'র ইতিহাস এবং বিকাশ

সৈদ্ধান্তিক অধিষ্ঠান

সরকারের উপলব্ধি

আমাদের বিচার পরিবার

স্থানীয় বিষয়

২. জেলা স্তরে বর্গের বিষয় ঃ

বি জে পি'র ইতিহাস এবং বিকাশ (জনসঙ্ঘ থেকে বি জে পি)

সৈদ্ধান্তিক অধিষ্ঠান

সরকারের উপলব্ধি

আমাদের বিচার পরিবার

পার্টির কার্যপদ্ধতি ও পার্টির সংগঠন রচনা

একাত্ম মানববাদ

সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রবাদ

কার্যকর্তা / ব্যক্তিত্ব বিকাশ

মিডিয়া প্রবন্ধন

সোশ্যাল মিডিয়া

প্রদেশ অনুসারে (দুই বিষয়)

দেশের সামনে চ্যালেঞ্জ

প্রশিক্ষণ বর্গের সময়সীমা ঃ

১. মণ্ডল স্তরে বর্গ (সময় ১ রাত্রি ২ দিন)

এই বর্গ প্রথম দিন বিকাল ৪টায় শুরু হবে এবং দ্বিতীয় দিন বিকাল ৪টায় শেষ হবে।

২. জেলা স্তরের বর্গ (সময় ২ রাত ৩ দিন)

৩. শিক্ষার্থী চয়ন ঃ

মন্ডল স্তরে সব সক্রিয় সদস্য (১০০ জন সদস্য যাঁরা করেছেন) এই বর্গে উপস্থিত থাকা আবশ্যক।

যে সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ পার্টির বিচার ধারাতে বিশ্বাস করেন এবং পার্টির বিস্তার চান সেই সব ব্যক্তিদের সক্রিয় সদস্যতা না থাকলেও ডাকা আবশ্যক।

মন্ডল স্তরের বর্গে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের মধ্যে ১০ শতাংশ প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের উপস্থিতি আবশ্যক।

সর্বস্পর্শী কার্যকে মনে রেখে মহিলা, অনুসূচিত জাতি, অনুসূচিত জনজাতির ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্ব সঠিক অনুপাতে হওয়া আবশ্যক।

নগর স্তরে (বিধায়ক, কাউন্সিলার, মেয়র) গ্রামীন স্তরে পঞ্চায়েত সদস্য, পঞ্চায়েত প্রধান প্রমুখ জনপ্রতিনিধিদেরও এই বর্গে সামিল করা প্রয়োজন।

যে সমস্ত প্রতিষ্ঠিত নাগরিক, অনুসূচিত জাতি, অনুসূচিত জনজাতি এবং মহিলাগণ এই বর্গে অংশগ্রহণ করবেন তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ না থাকা বাঞ্ছনীয় এবং তাদের সক্রিয় সদস্যতা অবশ্য থাকা উচিত।

বর্গে সংখ্যা অধিকতম ১৫০ হবে। সংখ্যা বেশী হলে দুই বা ততোধিক বর্গ করা যেতে পারে। **মণ্ডল স্তরে বুথ স্তর পর্যন্ত প্রশিক্ষণের জন্য ভাবনা রাখা।**

জেলা ঃ

বর্তমান জেলা কার্যকারিণীর সদস্য, মণ্ডলের কোর কমিটির সদস্য, জেলা পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধি (যদি থাকেন) এরা থাকবেন। এছাড়া ওই জেলার অন্তর্গত নির্বাচিত বিধায়ক, ভূতপূর্ব বিধায়ক (যদি থাকেন) এদের সংখ্যা মোট উপস্থিতির ৪০% থাকা উচিত।

এছাড়া মণ্ডল স্তরে আয়োজিত বর্গের প্রতিনিধিদের মধ্যে থেকে প্রতিনিধি চয়ন করতে হবে।

জেলা স্তরে সামাজিক ক্ষেত্রে, অন্য ক্ষেত্রে এবং সাধারণ শ্রেণীর মধ্যে যাঁরা প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি যিনি বি জে পি'র সক্রিয় সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন এই রকম ব্যক্তিবর্গদের বর্গে আসার অনুমতি দেওয়া উচিত।

সংগঠনের সর্বস্পর্শী কাজকে মনে রেখে মহিলা, অনুসূচিত জাতি, অনুসূচিত জনজাতির ব্যক্তিদের সঠিক অনুপাতে বর্গে অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে।

বর্গে সংখ্যা অধিকতম ১৫০ হবে। সংখ্যা অধিক হলে দুই বা ততোধিক সংখ্যায় বর্গ করা যেতে পারে।

ভারতীয় জনতা পার্টি
ইতিহাস এবং বিকাশ

- দ্বি-জাতি তত্ত্বের ধারণা আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে দূষিত করে দিয়েছে। সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতাবাদের তোষণ এবং জাতীয় নেতৃত্বের দূরদর্শিতার অভাবে ধর্মের ভিত্তিতে ভারত বিভাজন মেনে নেওয়া হলো। দেশভাগের তীব্র বিরোধীতার কারণে কংগ্রেস সরকার মহাত্মা গান্ধী হত্যার মিথ্যা অভিযোগে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘকে নিষিদ্ধ করে।

- ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী সমগ্র বাংলাদেশকে পাকিস্তানের হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন, এই আন্দোলনের ফলে পাকিস্তান বাংলার অর্ধেক পেলো। গান্ধীর পরামর্শে নবগঠিত জাতীয় মন্ত্রীসভায় ডঃ মুখার্জীকে জায়গা দিতে বাধ্য হন নেহেরু। কিন্তু পাকিস্তানের প্রতি নরম নীতি এবং পাকিস্তানের হিন্দু নিরাপত্তা সম্পর্কে উদাসীনতা প্রদর্শনকারী নেহেরু-লিয়াকত চুক্তির বিরুদ্ধে ডঃ মুখার্জী মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেন।

- এই দুটি পরিপ্রেক্ষিতে জনসঙ্ঘের জন্ম। ডঃ মুখার্জী রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রী মাধবরাও সদাশিবরাও গোলওয়ালকরের সঙ্গে মিলিত হন এবং জনসঙ্ঘ তৈরীর কাজ শুরু হয়। ১৯৫১ সালের মে মাসে কথা শুরু হবার পর এবং ২১শে অক্টোবর, ১৯৫১ সালে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর সভাপতিত্বে ভারতীয় জনসঙ্ঘ গঠিত হয়। দিল্লীতে রাজোমল কন্যা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভারতীয় জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হয়। আয়তাকৃতি গৈরিক পতাকা, মধ্যভাগে দীপক (প্রদীপ) দলীয় পতাকা হিসেবে স্বীকৃত হলো, দীপক (প্রদীপ) হলো নির্বাচনী প্রতীক। এই সভায় ১৯৫২র মার্চ মাসের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের ইস্তেহারও পাশ করা হয়।

- প্রথম সাধারণ নির্বাচনে ভারতীয় জনসঙ্ঘ ৩.০৬ শতাংশ ভোট পায় এবং ডঃ মুখার্জীসহ তিনজন সাংসদ বিজয়ী হন। জনসঙ্ঘ এই ভোটের মাধ্যমে জাতীয় দলের মর্যাদা পায়। সংসদে ডঃ মুখার্জীর নেতৃত্বে আকালী দল, গণতন্ত্র পরিষদ, হিন্দু মহাসভা, তামিলনাড়ু টয়লার্স পার্টি, দ্রাবিড় কাজাঘাম, লোকসেবক সঙ্ঘ এবং কিছু নির্দল সহ ৩৮ জন সাংসদকে (৩২জন লোকসভা এবং ৬ রাজ্যসভা)

নিয়ে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়ে তোলেন। এইভাবেই জনসঙ্ঘের কেন্দ্রীয় সভাপতি ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী লোকসভার প্রথম বিরোধী দলনেতা হিসেবে স্বীকৃত হন।

- ২৯শে মে, ১৯৫২। জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভা ভারতরাষ্ট্রের অধীন একটি স্বায়ত্ত রাজ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ২৪শে জুলাই, ১৯৫২ নেহেরু-শেখ আবদুল্লা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ভারতবর্ষের বুকে যে রাজ্য ইতিপূর্বেই মিশে গেছে, তাকে এই বিশেষ মর্যাদা দান একটা চক্রান্ত ছাড়া অন্য কিছু নয়। এই মর্যাদার ফলে, জম্মু-কাশ্মীরে পৃথক সংবিধান, পৃথক প্রধানমন্ত্রী, পৃথক পতাকা সৃষ্টি হলো। এর প্রতিবাদে জম্মু-কাশ্মীরে প্রজা পরিষদ দল আন্দোলন শুরু করলো এবং ভারতীয় জনসঙ্ঘ একে সমর্থন জানালো। লোকসভায় ডঃ মুখার্জী এই পৃথকীকরণের বিরুদ্ধে এক জ্বালাময়ী ভাষণ দিলেন। জম্মু-কাশ্মীরে শুরু হলো তীব্র আন্দোলন।

- ২৯থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৫২, কানপুরে ভারতীয় জনসঙ্ঘের প্রথম অধিবেশন হয়। পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়কে দলের সাধারণ সম্পাদক মনোনীত করা হয়। দীনদয়ালজী সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ওপর প্রস্তাব রাখতে গিয়ে ভূ-সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ এর তত্ত্ব রাখেন। এটি ভারতীয় জনসঙ্ঘের প্রথম আদর্শগত প্রস্তাব। সঙ্গে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের দাবীও তোলা হয়েছিল।

- ১৯৫৩ সালের মার্চে কাশ্মীরের সম্পূর্ণ একতার জন্য দিল্লীতে সত্যাগ্রহ শুরু হয়। ১১ই মে, ১৯৫৩ বিনা পারমিটে সত্যাগ্রহ করতে ডঃ মুখার্জী কাশ্মীরে প্রবেশ করেন। তাঁকে গ্রেপ্তার করে শ্রীনগরে নিয়ে যাওয়া হয়। সারা দেশে থেকে সত্যাগ্রহ করার জন্য বিনা পারমিটে ১৩,৭৫০ জন সত্যাগ্রহী কাশ্মীরে গিয়েছিলেন। ২৩শে জুন, ১৯৫৩ বিষপ্রয়োগে ডঃ মুখার্জীকে হত্যা করা হলো। সত্যাগ্রহ স্থগিত করা হলো।

- দেশব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় ওঠায় ৯ই আগস্ট শেখ আব্দুল্লাকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে গ্রেপ্তার করা হয়। সাথে সাথে পারমিট পদ্ধতির বিলোপ ঘটে।

- ২২শে থেকে ২৫শে জানুয়ারী, ১৯৫৪, ভারতীয় জনসঙ্ঘের দ্বিতীয় অধিবেশন বোম্বেতে হয়, যেখান থেকে স্বদেশীর আওয়াজ তোলা হয়। এই অধিবেশনে রাশিয়ার অনুকরণে গৃহীত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিরোধিতা করা হয়।

- ইংরেজরা ১৯৪৭ ভারত ছাড়লেও পর্তুগীজ এবং ফরাসীদের অধীনে গোয়া-দমন দিউ এবং পণ্ডিচেরী পরাধীন থেকে গিয়েছিল। এই রাজ্যগুলির স্বাধীনতার জন্য জনসঙ্ঘ আন্দোলন শুরু করে। ২২শে জুলাই, ১৯৫৪ তারিখে দাদার স্বাধীন হয়। সর্বভারতীয় সম্পাদক শ্রী জগন্নাথ রাও যোশীর নেতৃত্বে ১০১ জন সত্যাগ্রহীর একটি দল গোয়ায় প্রবেশ করে পর্তুগীজ সরকার তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করে, তাঁদের ওপর অত্যাচার শুরু করে দেয়। মধ্যপ্রদেশের শ্রী রাঙ্গভাউ মহাকাল এবং উত্তরপ্রদেশের শ্রী আমির চাঁদ গুপ্তা অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে শহীদ হন।

- শিক্ষাব্যবস্থা পরিবর্তনের ডাক দিয়ে ২৮শে ডিসেম্বর থেকে ২রা জানুয়ারী, ১৯৫৫ জনসঙ্ঘের তৃতীয় সর্বভারতীয় অধিবেশন যোধপুরে বসে। কাশ্মীর আন্দোলনের নেতা শ্রী প্রেমনাথ ডোগরা সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯ থেকে ২২শে এপ্রিল ১৯৫৬ জয়পুরে চতুর্থ অধিবেশন হয়। বিখ্যাত অস্ত্রশাস্ত্রবিদ আচার্য্য শ্রী দেবপ্রসাদ ঘোষ সভাপতি হন। পঞ্চম অধিবেশন দিল্লীতে হয়। রাজ্যগুলোকে রেজারেশান করার উপযোগী করে তৈরী করা হতে লাগলো। প্রাদেশিকতা এবং হিংসা তার নগ্নরূপ দেখাতে লাগল। দিল্লী ফনফারেন্সে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ভারতীয়করণ এর প্রস্তাব গৃহীত হলো এবং একই সঙ্গে ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে লড়াই করার জন্য ইশতেহার প্রস্তুত করা হয়।

- ৮ই আগস্ট ১৯৫৭ তারিখে প্রথম ১১ দিন ব্যাপী জনসঙ্ঘের শিক্ষণ শিবির বিলাসপুরে সমাপ্ত হয়।

- আচার্য্য শ্রী দেবপ্রসাদ ঘোষের সভাপতিত্বে ৪থেকে ৬ই এপ্রিল, ১৯৫৮ তারিখে ষষ্ঠ অধিবেশন আম্বালায় অনুষ্ঠিত হয়। ইলেক্টোরাল রিফর্ম (নির্বাচনী পরিবর্তন) করার জন্য সাংবিধানিক ব্যবস্থা দাবী করা হয়। আচার্য্য দেবপ্রসাদ ঘোষের সভাপতিত্বে সপ্তম অধিবেশন ২৬-২৮ ডিসেম্বর ১৯৫৮ তারিখে বাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৫৭র সাধারণ নির্বাচনে জনসঙ্ঘ ৪টি আসনে বিজয়ী হয় এবং ভোট বেড়ে দাঁড়ায় ৫.৯৩ %।

- ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৮, নেহেরু-নুন চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো এবং তার ফলে জলপাইগুড়ি জেলার বেরুবাড়ীকে পাকিস্তানের হাতে তুলে দেওয়া হয়। সারা ভারত জুড়ে জনসঙ্ঘ বেরুবাড়ী বাঁচানোর জন্যে আন্দোলন শুরু করে।

- চীন কর্তৃক সীমান্তে অনুপ্রবেশ করার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ হয়। একই সঙ্গে তিব্বতের স্বাধীনতা দাবী করা হয়। সারা বছর ধরে জন জাগরণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

- ২৭শে জুন থেকে ৬ই জুলাই, ১৯৫৯, দশদিন ব্যাপী বিধায়ক এবং সাংসদদের পুণাতে শিক্ষণ কর্মশালা হয়।

- ২৩শে থেকে ২৫ জানুয়ারী, ১৯৬০ শ্রী পীতাম্বর দাসের সভাপতিত্বে জনসঙ্ঘের পঞ্চম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সরকারের শ্রান্ত হিন্দী-চীনি ভাই ভাই নীতি এবং চীনা আগ্রসানের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা হয়। ৩১শে ডিসেম্বর থেকে ১লা জানুয়ারী, ১৯৬১ জনসঙ্ঘের নবম অধিবেশন শ্রী রামা রাওয়ারে সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। ২৯-৩১ ডিসেম্বর, ১৯৬২তে ভুপালে বিদগ্ধ ভাষাবিদ ড: রঘুবীরের সভাপতিত্বে দশম অধিবেশন হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ একটি গাড়ী দুর্ঘটনায় ১৪ই মে, ১৯৬৩ ড: রঘুবীর মারা যান। আচার্য্য শ্রী দেবপ্রসাদ ঘোষ পুনরায় সভাপতি নির্বাচিত হন। আচার্য্য শ্রী দেবপ্রসাদ ঘোষের সভাপতিত্বে ২৮-৩০ ডিসেম্বর, ১৯৬৩ আমোদবাদে একাদশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

- ১৯৬২র তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনে জনসঙ্ঘের ১৪জন সাংসদ নির্বাচিত হন। ভোটের হার ৬.৪৪%। জনসঙ্ঘের ইতিহাসে ১৯৬৪ একটি মহিল ফলক। ১০-১৫ই আগস্ট গোয়ালিয়রে এক শিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে নীতি এবং আদর্শের ড্রাফট তৈরী করা হয়, যার মধ্যে একাত্ম মানববাদের প্রতিপাদ্য ছিল। ১৯৬৪র নভেম্বরে জাতীয় কর্মসমিতি এই ড্রাফট গ্রহণ করেন এবং বচ্ছেররাজ ব্যাসের সভাপতিত্বে ২৩-২৫ জানুয়ারী, ১৯৬৫ বিজয়ওয়ারার দ্বাদশ অধিবেশনে সরকারীভাবে একাত্ম মানববাদ দলের দর্শন হিসেবে গ্রহণ করা হল। ডিসেম্বর, ১৯৬৪ সালে জনসঙ্ঘ পরমাণু বোমা নির্মাণের দাবী জানালো।

- ১৯৬৫ মার্চে পাকিস্তান কচ্ছ আক্রমণ করে, ভারত সরকার পাকিস্তানের সঙ্গে শান্তি প্রয়াস চায়। ভারতীয় জনসঙ্ঘ সঙ্গে সঙ্গে এর বিরোধীতা করে। জুলাই-আগস্ট মাস দেশজুড়ে জনসঙ্ঘ আন্দোলন গড়ে তোলে। দেশের এক লক্ষের বেশী স্থানে বিক্ষোভ দেখানো হয় এবং ১৬ই আগস্ট দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৫ লক্ষের বেশী কার্য্যকর্তা দিল্লীতে কচ্ছ চুক্তির বিরুদ্ধে দেশের সর্ববৃহৎ আন্দোলনে যোগ দেন। স্লোগান ছিল "ফৌজ ন হারি, কৌম ন হারি, হার গয়ি সরকার হমারী," (সৈন্য হারেনি, দেশবাসী হারেনি, হেরে গেছে আমাদের সরকার)।

- আন্দোলনের বিশালতা দেখে প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী যুদ্ধের জন্যে তৈরী হন। ১লা সেপ্টেম্বর যুদ্ধ শুরু হল। জনসঙ্ঘ সরকারের সঙ্গে এবং সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সহায়তা করে গেছে। ভারতীয় সৈন্য বাহিনী বিজয়ী হলো। রাশিয়ার মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হলো এবং তাসখন্ডে একটি শীর্ষবৈঠকের ব্যবস্থা করা হয়। জনসঙ্ঘ এর তীব্র প্রতিবাদ করে। ভারতীয় সৈন্য পাকিস্তানের যে সমস্ত জায়গা দখল করেছিল, সেগুলো পাকিস্তানকে ফিরিয়ে দেওয়া এক চুক্তি তাসখন্ডে রাতের বেলায় সই করলেন লালবাহাদুর শাস্ত্রী এবং সেই রাতেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন লালবাহাদুর। ভারতীয় জনসঙ্ঘ তাসখন্ড চুক্তির তীব্র বিরোধীতা করে।

- ১৯৬৬ এপ্রিলে ভারতীয় জনসঙ্ঘের ১৩৩ম সম্মেলন অধ্যাপক বলরাজ মাধোকের সভাপতিত্বে জলন্ধরে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৬৭তে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন হয়। জনসঙ্ঘ এবার কংগ্রেসের পরেই দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসে। লোকসভার ৩৫জন সাংসদ নির্বাচিত হলেন। ভোট বেড়ে দাঁড়ালো ৯.৪১শতাংশ। বিধানসভাগুলিতে ২৬৮জন জিতে জনসঙ্ঘ ২ নং স্থানে পৌঁছে গেলো।

- ১৯৬৭র মার্চে বিহারে প্রথম অকংগ্রেসী সরকার গঠিত হলো, জনসঙ্ঘ তার বড় অংশীদার। এর পরেই সংযুক্ত বিধায়ক দল গঠন করে পাঞ্জাব, দিল্লী, উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা এবং মধ্যপ্রদেশে সরকার গঠিত হয়। জনসঙ্ঘ এই সময় প্রধান দল। ২৬-৩০ ডিসেম্বর, ১৯৬৭ কালিকটে চতুর্দশ অধিবেশন বসে। সাধারণ সম্পাদক পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের হাতে যে জনসঙ্ঘ এত দিন বেড়ে উঠেছিলো, এই কালিকটেই তিনি সভাপতি নির্বাচিত হলেন। দীনদয়ালজী

এখানেই তাঁর ঐতিহাসিক সভাপতির ভাষণ রাখেন। যিনি এত দিন পাদপ্রদীপের আলো থেকে দূরে অবস্থান করে দলকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন, আজ তিনি এসে গেলেন প্রদীপের উজ্জ্বল আলোয়। কিন্তু নিয়তি অন্য রকম ভেবেছিল। ১৯৬৮র ১০ই ফেব্রুয়ারী দীনদয়ালজীকে খুন করা হলো। দেশের রাজনীতিতে এক ভয়ঙ্কর আঘাত

- ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৮ অটলজী জনসঙ্ঘের সভাপতি হলেন। ৮-১১ই জুলাই প্রথম সর্বভারতীয় মহিলা শিক্ষণ শিবির নাগপুরে অনুষ্ঠিত হয়। ২৫-২৭শে এপ্রিল, ১৯৬৯, জনসঙ্ঘের পঞ্চদশ অধিবেশন বম্বেতে অনুষ্ঠিত হয়। এখানে অটলবিহারী আবার সভাপতি নির্বাচিত হন। এটা সেই অধিবেশন, যেখান থেকে আওয়াজ উঠে, প্রধানমন্ত্রী কী আগলি বাত্তি, অটল বিহারী, অটল বিহারী। ২-৮ জুলাই, ১৯৬৯ রায়পুরে সর্বভারতীয় শিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

- ২৮-৩০ ডিসেম্বর, ১৯৬৯ অটলবিহারী বাজপেয়ীর সভাপতিত্বে পাটনায় ষোড়শ অধিবেশন হয়। কংগ্রেস, কম্যুনিস্ট এবং মুসলিম লীগের অরুচ আঁতাতের বিরুদ্ধে ওখানেই স্লোগান ওঠে 'তিন তিলকে'। সারা দেশে ছড়িয়ে পড়লো এই স্লোগান। পাটনাতেই স্বদেশী পরিকল্পনা ঘোষিত হয়। আবার ওঠে ভারতীয়করণের স্লোগান। ১৯৭০এর জুলাই মাসে সম্পূর্ণ নিযুক্তির পরিকল্পনায় ঘোষণা করা হয়।

- দারিদ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দিয়ে ১৯৭১এর জানুয়ারীতে নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশ করে কংগ্রেস। সংযুক্ত বিধায়ক দল থেকে দলত্যাগের রাজনীতি এবং ইন্দিরা গান্ধী কর্তৃক কংগ্রেসের বিভাজনের কারণে দেশ জুড়ে রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমবর্দ্ধমান। অকংগ্রেসী সরকারগুলির শরিক ভারতীয় জনসঙ্ঘ। সংসদে জনসঙ্ঘের সংখ্যা ৩৫ থেকে ২১এ নেমে আসে এবং ভোট শতাংশও নেমে আসে। শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী এক ঐতিহাসিক জয় সূচিত করলেন।

- ১৯৭১ এর ডিসেম্বর, পাকিস্তান ভারতকে আক্রমণ করে। বাংলাদেশ যুদ্ধ শুরু হলো। জনসঙ্ঘ আবার সরকারের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সহযোগিতায় নামলো। ভারত জিতলো, বাংলাদেশের জন্ম হলো। জনসঙ্ঘ দিল্লীতে এক বিশাল বিক্ষোভ করে বাংলাদেশের স্বীকৃতি দাবী করে ২রা এপ্রিল, ১৯৭২ পালন করলো আর কোন তাসখন্দ নয় দিবস।

- দলিতদের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদে বম্বের হুতাত্মা চকে অটলবিহারী বাজপেয়ী প্রতীকী অনশনে বসলেন।

- বাংলাদেশ যুদ্ধ জয়ের পর যে সিমলা চুক্তি হলো জনসঙ্ঘ তার বিরোধিতা করে রাজস্থান সীমান্তে পাকিস্থানের গদরা রোড প্রত্যার্পণ করার প্রতিবাদে অটলজী গদরা রোডে গিয়ে সত্যাগ্রহে বসেন। সিমলা চুক্তির প্রতিবাদে সংসদের সামনে বিশাল বিক্ষোভ প্রদর্শন হয়। ৩রা আগস্ট শিয়ালকোট এলাকায় ডঃ জগন্নাথ রাও জোশী এবং গুজরাটের সুহনামে ডঃ ভাই মহাবীর সত্যাগ্রহ করেন।

- ঋষি অরবিন্দের জন্ম শতবর্ষকে ভারতীয় জনসঙ্ঘ ১৫ই আগস্ট 'অখণ্ড ভারত দিবস' হিসেবে পালন করে।

- ১৯৭১ এর বিজয় ইন্দিরা গান্ধীকে একরোখা করে তোলে। তার রাজত্বে দুর্নীতি, নিষ্পেষণ এবং ঔদ্ধত্য একীভূত হয়ে পড়ে। ১৯৭২ এর ডিসেম্বর জনসঙ্ঘের ১৮তম অধিবেশন কানপুরে শ্রীলালকৃষ্ণ আদবানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সারা দেশ জুড়ে ইতিমধ্যেই গুজরাটের নব নির্মাণ আন্দোলন এবং বিহারের সমগ্র ক্রান্তি আন্দোলন নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়ে গিয়েছে। এই আন্দোলনে নেতা হিসেবে এগিয়ে এলেন শ্রী জয়প্রকাশ নারায়ণ। বিদ্যার্থী পরিষদ সামনে থেকে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছিলো। জনসঙ্ঘ এই আন্দোলনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী হয়ে গেলো। জয়প্রকাশকে এই আন্দোলনে জুড়বার জন্যে নানাজী এক অসাধারণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। দ্বিতীয়বারের জন্য সভাপতি হওয়া আদবানীজী ১৯৩ম অধিবেশনে (১৯ থেকে ২১ই মার্চ, ১৯৭৩) জয়প্রকাশকে আন্দোলনে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানালেন। জয়প্রকাশ বললেন, যদি জনসঙ্ঘ ফ্যাসিষ্ট হয় তবে আমিও ফ্যাসিষ্ট।

- উপ নির্বাচনে কংগ্রেস পরাজিত হলো এবং শ্রী রাজনারায়ণের আবেদনের ভিত্তিতে এলাহাবাদ হাইকোর্ট ইন্দিরা গান্ধীর নির্বাচনকে অবৈধ বলে রায় দিলেন এবং তাঁকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন। সাথে সাথেই ২৫ জুন, ১৯৭৫ এর মধ্যরাত্রে থেকে সারা দেশ জুড়ে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হলো এবং গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করা হলো। সমস্ত বিরোধী নেতৃবৃন্দকে মিসায় গ্রেপ্তার করা হলো, অনেকেই অন্তরালে গেলেন।

আর এস এসকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো। পরের বছর সাধারণ নির্বাচন হওয়ার কথা কিন্তু সংবিধান সংশোধন করে লোকসভাকে আরও একবছর বাড়িয়ে দেওয়া হলো, ফলত: নির্বাচন হলো না।

- জয়প্রকাশ নারায়ণ লোক সংঘর্ষ সমিতির দায়িত্ব নানাজী দেশমুখের হাতে তুলে দেন। সারাদেশ জুড়ে বিশাল এবং ব্যাপক আন্দোলন শুরু হলো। লক্ষ মানুষের ঠিকানা হলো কারাগার। এই আন্দোলনের পুরোভাগে রইলেন জনসঙ্ঘের কার্যকর্তা এবং সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা। ১৯৭৭এ নির্বাচন হলো আর সেই সঙ্গে ঘটে গেলো নিঃশব্দ বিপ্লব। শুধু যে কংগ্রেস হারলো, তাই নয়, ইন্দিরা এবং তাঁর পুত্র সঞ্জয়ও পরাজিত হলেন। এই নির্বাচনে জনতা পার্টি সর্বত্র জয়লাভ করল। জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে ভারতীয় জনসঙ্ঘ, সমাজবাদী পার্টি, ভারতীয় লোকদল এবং সংগঠন কংগ্রেস মিলিত হয়ে একটি দল গঠিত হলো। ২৩শে মার্চ, ১৯৭৭ নির্বাচনের সাথে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহৃত হলো। জনসঙ্ঘ মিলে গেলো জনতা পার্টিতে। জনসঙ্ঘের তিন নেতা মন্ত্রী মনোনীত হলেন।

- পারস্পরিক ঈর্ষা এবং ক্ষমতার রাজনীতির শিকার হলো এই নবগঠিত জনতা পার্টি। অগ্রগতি আটকানোর জন্যে জনসঙ্ঘ কর্মীদের উদ্দেশ্যে দ্বৈত সদস্যতার প্রশ্ন তোলা হলো। হয় জনসঙ্ঘ কর্মীরা জনতা পার্টি ছাড়বেন, অথবা আর এস এসের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতে হবে। এই বিষয়ে তিক্ততা বাড়তে থাকলে জনসঙ্ঘ নেতারা জনতা পার্টি ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন এবং পঞ্চনিষ্ঠার ভিত্তিতে ৬ই এপ্রিল, ১৯৮০ তারিখে ভারতীয় জনতা পার্টি স্থাপিত হলো।

- ১৯৮০ সালের মধ্যবর্তী লোকসভা নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধী বিজয়ী হলেন। জনতা পার্টি বিভাজনের পর আবার চেষ্টা হলো সমগ্র অকংগ্রেসী দলগুলিকে এক করে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াই করার। জনসঙ্ঘ নেতৃবৃন্দ এবার অত্যন্ত সতর্ক, তাদের পরিচিতি নষ্ট হতে পারে, এমন কোন জোটে তাঁরা যেতে আগ্রহী নন। ৩১শে অক্টোবর, ১৯৮৪ ইন্দিরা গান্ধী তাঁর এক দেহরক্ষীর গুলিতে নিহত হলেন। সারাদেশ জুড়ে হয়ে গেলো শিখ নিধন তান্ডব। হিন্দু এবং শিখদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির অবসানের জন্য বি জে পি এবং সঙ্ঘের কার্যকর্তারা নিরলস প্রয়াস চালিয়ে গেলেন। ৩১শে অক্টোবর রাষ্ট্রপতি জ্ঞানী জৈল সিং রাজীব গান্ধীকে প্রধানমন্ত্রীর পদে শপথ গ্রহণ করান। সহানুভূতির বন্যায় ১৯৮৪র নির্বাচন

কংগ্রেসের অনুকূলে ভাসিয়ে দিলো। ভারতীয় জনতা পার্টি, এই প্রথম দুটি মাত্র আসনে বিজয়ী হলো।

- এই নির্বাচনের পরেই দলে খুঁটিয়ে সমীক্ষা করা হয়। শ্রী কিষেণলাল শর্মার নেতৃত্বে একটি ওয়ার্কিং টিম গঠিত হলো যাঁরা বললেন দলের মূল আদর্শ হিসেবে একাত্ম মানববাদকে ঘোষণা করা হোক। ফলত: ১৯৮৫ সালে গান্ধী নগরে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় কার্যকারিণীতে দলীয় সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বি জে পিকে একটি কর্মী ভিত্তিক সংগঠনে পরিণত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ১৯৮৬ সালে দলীয় সভাপতির দায়িত্ব শ্রী লালকৃষ্ণ আদবানীর ওপর ন্যস্ত হয়।

- রাজীব গান্ধীর একটি মি: ক্লীন ভাবমূর্তি থাকার জন্য অতি দ্রুত অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। বি জে পি জাতীয় রাজনীতিতে সাময়িক ভাবে একপাশে চলে যায়। কিন্তু ১৯৮৭ সালে বোফর্স কামানের দুর্নীতি সামনে আসতে এক প্রবীণ মন্ত্রী শ্রী ভি পি সিং বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। রাজীব গান্ধীর মি: ক্লীন চেহারা মুহূর্তে ধূলিসাৎ হয়ে যায়।

- শাহবানু মামলায় রাজীবের সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতি প্রকাশ্যে উঠে আসে। বি জে পি কর্মীরা সারাদেশ জুড়ে বিশাল জনজাগরণ আন্দোলন করে। আওয়াজ ওঠে এক সিভিল কোডের। ১৯৮৮ জানুয়ারীতে বি জে পি রাজীব গান্ধীর পদত্যাগ এবং অন্তর্বর্তী নির্বাচন দাবী করল।

- সারা দেশ জুড়ে সত্যাগ্রহ শুরু হয়ে গেলো। ৩রা মার্চ, ১৯৮৮ শ্রী লালকৃষ্ণ আদবানী আবার দলের সভাপতি নির্বাচিত হলেন। ১৯৮৮ আগস্টে জাতীয় ফ্রন্ট গঠিত হলো। এন.টি.রামারাও এর সভাপতি এবং ভি পি সিং আহ্বায়ক হলেন।

- ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৮৯ বিজেপি এবং শিবসেনা জোট হলো। নির্বাচনী ফলাফল প্রত্যাশিত ছিল। রাজীব গান্ধীর সরকার ক্ষমতাচ্যুত হলো। ৮৪র ২জন সাংসদ ৮৯ সালে ৮৬ হলো। বোফর্স ইস্যুর সঙ্গে বি জে পি এবার নতুন স্লোগান রাখলো 'সকলের জন্য ন্যায়, কারও জন্যে তোষণ নয়'। প্রথমবার লোকসভায় লালকৃষ্ণ আদবানী নির্বাচিত হলেন।

- ১৯৮৯ এর জুনে, হিমাচল প্রদেশের পালমপুরে অনুষ্ঠিত জাতীয় কার্যকারিণীতে রাম জন্মভূমি আন্দোলনকে সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রবাদের এটা একটা জ্বলন্ত ইস্যু। এটা ছদ্ম-ধর্ম নিরপেক্ষবাদীদের সঙ্গে সর্বধর্ম সমভাবে বিশ্বাসীদের লড়াই। পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মদিন ২৫শে সেপ্টেম্বর সোমনাথ মন্দির থেকে আদবানীজীর রথযাত্রা শুরু হলো। যাত্রার শেষ হওয়ার কথা ৩০শে অক্টোবর অযোধ্যায়। অযোধ্যায় গিয়ে করসেবায় অংশ নেবে রথ। রথযাত্রা সারাদেশে জনগণের অভূতপূর্ব সমর্থন পেলো।

- ২৩শে অক্টোবর, বিহারের সমস্তিপুরে রথ আটকে আদবানীজীকে গ্রেপ্তার করে পাঁচ সপ্তাহ আটকে দেয় বিহার সরকার। সমস্ত নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ৩০শে অক্টোবর করসেবা হয়। চন্দ্রশেখর প্রধানমন্ত্রী হন। তিনি সংভাবে অযোধ্যা ইস্যুর সমাধান করতে গিয়ে ব্যর্থ হন। রাজীব গান্ধী সাত মাসের মধ্যে চন্দ্রশেখর সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করেন। জুলাই ১৯৯১ এ উত্তর প্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে বি জে পি বিজয়ী হয় এবং কল্যাণ সিং মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন। ছদ্ম-ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা পরাজিত হলো। লোকসভা নির্বাচনের সময়ে রাজীব গান্ধী নিহত হন। সমবেদনার হাওয়ায় কংগ্রেস বিজয়ী হয়। বিজেপির সাংসদ সংখ্যা ৮৬ থেকে বেড়ে ১১৯ হলো। নরসীমা রাওয়ের নেতৃত্বে কংগ্রেস সরকার গঠিত হলো। রামমন্দির ইস্যুর কোন সমাধান না হওয়ায় করসেবা মারফৎ ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৯২ বাবরি ধাঁচা ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

- ১৯৯৬, ৯৮ এবং ৯৯ সালে তিনটি লোকসভা নির্বাচন হলো যাতে বি জে পি একক বৃহত্তম দল হিসেবে নির্বাচিত হলো। প্রথমে ১৩দিন, পরে ১৩মাস এবং তারপরে সাড়ে চার বছর ধরে অটল বিহারী বাজপেয়ীর প্রধানমন্ত্রীত্বে এন. ডি. এ সরকার চলে। এটা এককভাবে বি জে পি সরকার ছিল না, এটি ছিল এন. ডি. এ সরকার। ২০০৪ এর এন. ডি.এ সরকার পরাজিত হয়, কংগ্রেস জোট ক্ষমতায় আসে।

- পরবর্তী দশবছর বি জে পি বিরোধী হিসেবে সক্রিয় এবং গঠনমূলক ভূমিকা গ্রহণ করে। ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এককভাবে বি জে পির সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। সবকা সাথ, সব কা বিকাশ, ঘোষণা নিয়ে বি জে পি এক গৌরবময় ভারতবর্ষ পুন:প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছে। শুধু তাই-ই নয়, অমিত শাহের সভাপতিত্বে ১১ কোটি সদস্য নিয়ে বি জে পি এখন পৃথিবীর বৃহত্তম রাজনৈতিক দল।

আমাদের বৈচারিক অধিষ্ঠান

আমাদের দলের প্রাণ ভোমরা কোন ব্যক্তি, নেতা, কোন পরিবার, বংশ, জাতি বা ধর্ম নয়, আমাদের দলের প্রাণ ভোমরা হল নীতি।

আমাদের নীতির অভিব্যক্তি "ভারত মাতা কি জয়" উদঘোষে রয়েছে। এই উদঘোষ আমাদের নীতির মূল ভিত্তি। এই জন্যই আমাদের জাতীয়তাবাদী বলা হয়। ভারত (মাটি) মাতা (সংস্কৃতি) ও জয় (জনগণ) কে ব্যক্ত করে। "ভূ জন এবং সংস্কৃতির সহযোগেই জাতীর নির্মাণ হয়, এই জন্যই দেশ ভক্তি আমাদের কাজের ভিত্তি। সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রবাদে আমাদের বিশ্বাস রয়েছে। "রাজনৈতিক রাষ্ট্রবাদ এবং পৃথকতাবাদের ভাব" সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রবাদের বিরুদ্ধে।

"ভারত বিভাজনের" সক্রিয়ভাবে বিরোধীতা করেছিল একমাত্র সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আর এস এস) ভারত বিভাজনের সময় পুরো বাংলাই হয়ত পাকিস্তানে চলে যেতো। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী এই বাংলাকে রক্ষা করেন। আর এস এস এর সরসঙ্ঘচালক শ্রী মাধব সদাশিব গোলওয়ালকর (শ্রী গুরুজি) ও ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী একমত হলেন যে ভারতবর্ষে একটি জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দল জরুরী যার ফলশ্রুতি ভারতীয় জনসঙ্ঘ। বিভাজনের হাত থেকে জম্মু-কাশ্মীরকে রক্ষা এবং ভারতবর্ষের সঙ্গে তার পূর্ণ বিলয়ের জন্য আন্দোলন করতে গিয়ে শহীদ হন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী। ডঃ মুখার্জীর আত্মবলীদানের ফলেই বর্তমানে জম্মু-কাশ্মীর ভারতবর্ষের অভিন্ন অংশ।

ভারতবর্ষের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য ভারতীয় জনসঙ্ঘ বহু আন্দোলন করে তার মধ্যে কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কেন্দুবাড়ি আন্দোলন, গোয়া মুক্তি আন্দোলন (গোয়ার আন্দোলনে বহু জনসঙ্ঘ কার্যকর্তা আত্মবলিদান দেন তার মধ্যে মধ্যপ্রদেশের রাজাভাউ মহাকাল ও উত্তর প্রদেশের আমীরচন্দ গুপ্তা প্রমুখ) কচ্ছ চুক্তি বিরোধী আন্দোলন ও শ্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর অসময় মৃত্যুর কারণে কলুষিত তাসখন্দ চুক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলনের স্মৃতি এখনও জনমানসের মনে তাজা রয়েছে। রাষ্ট্রের অখণ্ডতা আমাদের জন্য রাজনৈতিক তরজার বিষয় নয় বরং আমাদের কাছে এটি শ্রদ্ধার বিষয়।

১৯৪৭ সালে আমরা ইংরাজদের শাসন থেকে মুক্তি পাই কিন্তু ইংরাজ প্রীতি ও পাশ্চত্য ভাবের দাসত্ব থেকে মুক্তি পাইনি। রাশিয়া থেকে প্রেরণা প্রাপ্ত সমাজবাদী কেন্দ্রীয়করণ নীতির ভিত্তিতে তৈরী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বিরোধীতা করে জনসঙ্ঘ। "স্বদেশী অর্থব্যবস্থা"র কথা বলেছিল যার ভিত্তি ছিল "আর্থিক গণতন্ত্র ও বিকেন্দ্রীকরণ"। দীনদয়ালজী যার নাম দেয় "অর্থায়াম"।

পাশ্চাত্য সমাজবাদ না পুঁজিবাদ কোন পথ ভারতের, এই রাজনৈতিক বিতর্কের মধ্যেই ভারতীয় জনসঙ্ঘ নতুন এক পথের সন্ধান দেয়। ১৯৬৫ সালের বিজয়ওয়াড়া অধিবেশনে "একাত্ম মানববাদ" কে নিজেদের বিচার ধারারূপে গ্রহণ করে।

একাত্ম মানববাদের ভাব হল ব্যক্তি ও সমাজের একাত্মতা, সমাজ ও সৃষ্টি বা প্রকৃতির একাত্মতা এবং ভৌতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার মধ্যে মিলন ঘটায় এবং আগ্রহ রাখে সমাজ এই একাত্মতাকে অনুভব করে দেশের রাজনীতিতে প্রতিবিম্বিত করুক। ব্যক্তি, সমষ্টি, সৃষ্টি বা পরমেষ্টীর একাত্মতাই মানবের অস্তিত্বের মূল কথা।

পাশ্চাত্য "থিয়োক্রেসী"র বিরুদ্ধে তৈরী 'সেকুলারিজ্‌ম' এর অনুগামী হচ্ছে ভারতীয় রাজনীতি। কিন্তু মজার বিষয় ভারতে কখনও থিয়োক্রেসী (পুরোহিত তন্ত্র) ছিল না, আর হবেও না। ভারতীয় সংস্কৃতি "সম্প্রদায় নিরপেক্ষ" বা "সর্বধর্ম সমভাব" এর সংস্কৃতি। ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলির সেকুলারিজমকে মাননীয় লালকৃষ্ণ আডবানী রামরথ যাত্রার সময় "সুডো সেকুলারিজমের" নামে অভিহিত করেন। আমরা অসাম্প্রদায়িক "ধর্ম রাজ্যে"র সমর্থক। "ধর্ম রাজ্য" শব্দকে আধুনিক ভাষায় বলা চলে সাংবিধানিক স্ব রাজ্য।

গণতন্ত্র মানব দ্বারা খুঁজে বের করা শাসন ব্যবস্থাগুলির মধ্যে অন্যতম ভালো ব্যবস্থা। এই জন্য দীনদয়ালজী গণতন্ত্রের ভারতীয়করণ ও "লোকমত পরিষ্কার" এর ধারণা ব্যক্ত করেন।

জরুরী অবস্থার অত্যাচার ভারতীয় গণতন্ত্রকে কলঙ্কিত করে তোলে। গণতন্ত্রের রক্ষার জন্য বাবু জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে প্রচণ্ড জন আন্দোলন গড়ে ওঠে। গণতন্ত্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু রাজনৈতিক ঘটনা চক্রে পরিস্থিতি এমন হয় যে দেশের স্বার্থে ভারতীয় জনসঙ্ঘ নিজের অস্তিত্ব বিলিয়ে দেয় এবং জনতা পার্টিতে মিশে যায়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই এই সহযোগিতার রাজনীতির উপর ক্ষমতা দখলের রাজনীতি প্রধান হয়ে ওঠে। জনসঙ্ঘের নীতিনিষ্ঠ কার্যকর্তারা ক্ষমতা দখলের

রাজনীতির কারবারিদের চোখের কাঁটা হয়ে ওঠে। জনতা পার্টি ভঙ্গ হয় এবং ভারতীয় জনতা পার্টির জন্ম হয়। বি জে পি তার প্রথম অধিবেশনেই নীতিগত ভাবে পঞ্চনিষ্ঠার ঘোষণা করে—

১. জাতীয়একতা ও একাত্মতার প্রতি নিষ্ঠা।

২. গণতন্ত্রের প্রতি নিষ্ঠা।

৩. গান্ধীবাদী সমাজবাদ (পরে পরিবর্তন হয় : গান্ধীবাদী আর্থিক দৃষ্টিকোণ ও সমতাযুক্ত শোষণমুক্ত অর্থব্যবস্থা)।

৪. সকারাত্মক ধর্মনিরপেক্ষতা (পরে শব্দে পরিবর্তন হয়ে হয় : সর্ব ধর্ম সমভাব বা সকারাত্মক পন্থ নিরপেক্ষতা)।

৫. মূল্য আধারিত রাজনীতির প্রতি নিষ্ঠা।

পঞ্চনিষ্ঠা নির্ভর নীতির ভিত্তিতে ভারতীয় জনতা পার্টির জন্ম। সময়ের সঙ্গে এটা অনুভব হতে থাকে যে ভারতীয় সংস্কৃতির মূল নিষ্ঠাকে ব্যক্ত করে যে ভাব, যাকে ভারতীয় জনসঙ্ঘ ১৯৬৫ সালে বিজয়বাড়া অধিবেশনে 'একাত্ম মানববাদ' রূপে স্বীকার করেছিল তাকে আবার ভারতীয় জনতা পার্টির গ্রহণ করা উচিত এবং ১৯৮৫ সালের জাতীয় পরিষদ "একাত্ম মানববাদ" কে নিজের প্রধান নীতি হিসাবে ঘোষণা করে।

যেহেতু আমরা একটি রাজনৈতিক দল তাই শাসন ও বিরোধী দুই দায়িত্ব পালন করে সংবিধানিক ব্যবস্থার ব্যবহার করা আমাদের 'সাধন' এবং সমাজকে সিদ্ধান্তিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করানো আমাদের সাধ্য। আমরা যত বেশী এই সাধ্য ও সাধনের জন্য বিবেকের সাথে কাজ করব আমরা ততই ব্যবহারিক কর্ম ফল পেতে থাকব। রাজনীতির নীতিহীন গতিশীলতা অরাজকতা সৃষ্টি করে এবং শেষ পর্যন্ত দেশের ক্ষতি করে। আমাদের মনে রাখতে হবে ভারত মাতা কি জয়, বন্দেমাতরম্। আমরা রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতার পূজারী, আমাদের উদঘোষ "ডঃ মুখার্জীর বলিদানের কাশ্মীর ভারতবর্ষের অখণ্ড অংশ।

ভারত মাতা কি জয়।।

আমাদের আদর্শগত পরিবার

১৯২৫ সালের বিজয়াদশমীর দিন নাগপুরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হয়, সঙ্ঘ ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রবাদে বিশ্বাসী, ভারতীয়ত্ব বা হিন্দুত্ব এই রাষ্ট্রবাদের উৎস। সঙ্ঘ নিজেকে ক্ষমতা কেন্দ্রিক রাজনীতি থেকে দূরে রাখে। সঙ্ঘ জাতীয়তাবাদের প্রতি সমর্পণের মন নির্মাণ করে।

সঙ্ঘ হাজারো রকমের বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে এবং আজ এটি পৃথিবীর সর্ববৃহৎ স্বয়ংসেবী সংগঠন। স্বাধীনতার আগে ইংরেজদের চোখের বালি ছিল সঙ্ঘ, পরবর্তীকালে কংগ্রেসও সঙ্ঘকে নিষিদ্ধ করেছিল, কারণ কংগ্রেস ধর্মীয় ভিত্তিতে দেশ বিভাজন মেনে নিয়েছিল এবং সঙ্ঘ এই কারণটিরই তীব্র বিরোধী।

সঙ্ঘ নিজেকে সমগ্র ভারতীয় সমাজের সংগঠন হিসেবে মনে করে। এটা কোন বিশেষ ধর্ম, জাতি, বর্ণ, এলাকা, প্রদেশ অথবা দলের সমর্থকও নয়, বিরোধীও নয়। ভারতীয় সংস্কৃতির ওপর ভিত্তি করে ভারত রাষ্ট্রের পুনর্গঠন প্রয়োজন, এই বিশ্বাস নিয়ে স্বয়ংসেবকরা দিবারাত্র সমাজের বিভিন্ন সংগঠনে, বিভিন্ন অংশে কাজ করে চলেছেন। এই সংগঠনগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং স্বায়ত্ত, সঙ্ঘের সঙ্গে এর কোন সাংগঠনিক সম্বন্ধ নেই। সমস্ত সংগঠনই স্বায়ত্ত, এরা কোন রাজনৈতিক দলের লেজুড় নয়।

সঙ্ঘের দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজীর (শ্রী মাধবরাও সদাশিবরাও গোলওয়ালকর) সঙ্গে কথাবার্তার পরে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ভারতীয় জনসঙ্ঘ স্থাপনা করেন। শ্রী গুরুজী ডঃ মুখার্জীকে কয়েকজন অভিজ্ঞ কার্যকর্তা প্রদান করেন, তাদের নিয়ে তিনি একটি জাতীয়তাবাদী স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল সৃষ্টি করালেন, যার নাম দিলেন ভারতীয় জনসঙ্ঘ যা আজ ভারতীয় জনতা পার্টি নামে পরিচিত।

জনসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার আগে, অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ তৈরী করা হয়েছিল। সমস্ত ছাত্র সংগঠনই কোন না কোন রাজনৈতিক দলের লেজুড়, বিদ্যার্থী পরিষদ একমাত্র ছাত্র সংগঠন যেটি ক্রমান্বয়ে সক্রিয় এবং বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই দলের স্লোগান—"জ্ঞান, চরিত্র এবং একতা"। পরিষদের স্লোগান "আজকের ছাত্রই আজকের নাগরিক"। পরিষদ ছাত্রদের ট্রেড ইউনিয়ানে বিশ্বাস করে না, বিশ্বাস করে বৃহত্তর শিক্ষা পরিসরে। বিদ্যার্থী পরিষদকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে শ্রী যশবন্ত রাও কেলকরের ভূমিকা অপরিসীম।

জনসঙ্ঘের পর যে বৃহত্তম সংগঠনটি তৈরী হয়েছে তার নাম ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ। এর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক শ্রী দত্তপন্থ ঠেংরী। বি. এম. এস. লেবার ইউনিয়ান প্রতিষ্ঠিত বামপন্থী দলগুলির সামনে কঠিন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলো, "লাল গোলামী ছোড় বোলে বন্দেমাতরম"। "চাহে যো মজবুরি হো, হমারে মাঙ্গে পুরী হো" (যা কিছুই বাধা হোক না কেন, আমাদের দাবী মানতে হবে।) বামপন্থীদের এই স্লোগান ছিল অবাস্তব। বি. এম. এস বললো, "দেশহিত মে করেঙ্গে কাম, কামকে লেঙ্গে পুরা দাম" (দেশের উন্নয়নের জন্যে কাজ করবো, কাজের জন্য পুরো দাম নেবো)। বি. এম. এস. দেশের সামনে তিনটি ঘোষণা রাখল, "দেশ কা উদ্যোগীকরণ, উদ্যোগো কা শ্রমিকীকরণ এবং শ্রমিকো কা রাষ্ট্রীয়করণ" (দেশের শিল্পায়ন, শিল্পের শ্রমিকীকরণ এবং শ্রমিকদের রাষ্ট্রীয়করণ)। আজ বি. এম. এস. দেশের সর্ব বৃহৎ শ্রমিক সংগঠন।

স্বামী চিন্ময়ানন্দের সন্দিপনী আশ্রমে ভারতীয়দের বিভিন্ন বর্ণের ও সম্প্রদায়ের মধ্যে অখণ্ড বন্ধন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ গঠিত হয়েছিল। প্রাথমিক অবস্থায় এই সংগঠনের দায়িত্ব দাদাসাহেব আপ্তের হাতে ছিল পরে শ্রী অশোক সিঙ্ঘল ও বর্তমানে প্রবীণভাই টোগাড়িয়া।

শিক্ষা জগতে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা বিশাল কাজ করে চলেছেন। আজ ভারতবর্ষে বিদ্যাভারতী সর্বোচ্চ সংখ্যক বিদ্যালয় পরিচালনা করেন। এর প্রথম সংগঠন সম্পাদক শ্রী লক্ষ্মীরাম তেমর। কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে "শিক্ষক মহাসঙ্ঘ" নামে সংগঠন কাজ করছে। আর শিক্ষার মান বিচারের জন্য "শিক্ষামণ্ডল" কাজ করে চলেছে।

কলা এবং নাট্যজগতে "সংস্কারভারতী" এবং বুদ্ধিজীবীদের সংগঠনের জন্য "প্রজ্ঞা প্রবাহ" কাজ করছে। ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ভারতীয় ইতিহাস রচনার জন্য "ইতিহাস সংকলন যোজনা" এবং লেখক সাহিত্যিকদের মধ্যে 'ভারতীয় সাহিত্য পরিষদ" কাজ করছে।

"ভারতীয় বিকাশ পরিষদ", "অধিবক্তা পরিষদ", "লঘু উদ্যোগ ভারতী", "ন্যাশনাল মেডিকেল অর্গানাইজেশান (এন. এম. ও)", "আরোগ্য ভারতী" নিজ নিজ ক্ষেত্রে কাজ করে চলেছে। গ্রামীণ বিকাশ এবং গবেষণা ক্ষেত্রে "দীনদয়াল শোধ সংস্থান" এবং সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে "হিন্দুস্থান সমাচার" নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে।

জঙ্গল এলাকায় "বনবাসী কল্যাণ আশ্রম" এর বিশাল সংগঠন রয়েছে। এর মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা, চিকিৎসা এবং সহায়তা প্রকল্প চালানো হয়। অতি দুরবর্তী দুর্গম এলাকায় "একল বিদ্যালয়" শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে।

সেবা কার্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বয়ংসেবকরা বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে কাজ করে চলেছেন। যে কোন ধরনের প্রাকৃতিক কিংবা অন্য কোন দুর্যোগে স্বয়ংসেবকরা তৎক্ষণাৎ ত্রাণ সহায়তা নিয়ে ত্রাণ কাজে নিজেদের যুক্ত করে ফেলেন। সেটা উড়িষ্যার সাইক্লোন হোক কিংবা কাশ্মীরের বন্যা বা উত্তরাখণ্ডের হড়পা বান, ভূমিকম্প, সুনামি। সব থেকে আগে সাহায্যের হাত বাড়াবেন স্বয়ংসেবকরাই। বস্তি এলাকায় নির্দিষ্ট লক্ষ্যে নির্দিষ্ট কার্যক্রম চালায় "সেবা ভারতী"।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের জন্য বি. এম. এস ছাড়াও ভারতীয় কিষাণ সংঘের প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যখন অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বায়নের নাম দিয়ে এদেশে আগ্রাসন চালাতে এগোচ্ছিল, তখনই ঠেঙ্গড়ীজীর নেতৃত্বে গঠন করা হয় "স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ"।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ পুরুষদের সংগঠন, তাই মহিলাদের জন্য তৈরী করা হল "রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি"।

আজ এমন ক্ষেত্র নেই যেখানে ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তিতে কোন না কোন সংগঠন কাজ করছে। সংবাদপত্রে যে সব সংগঠনের নাম আসে তারা প্রধান সংগঠন। রাজ্যে এবং স্থানীয় স্তরে বহু সংগঠন একই আদর্শ নিয়ে কাজ করছে। সমাজ কখনও রাজনীতির অনুসারী হবে না। সমাজ হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ, ঠিক এই ভাবে এই সমস্ত সংগঠনগুলোও স্বয়ংসম্পূর্ণ। সঙ্ঘ এদের সঙ্গে সাংগঠনিক ভাবে যুক্ত নয় কিন্তু আদর্শগতভাবে সম্পৃক্ত। এরা প্রত্যেকেই পারস্পরিক আলোচনার মারফৎ কাজ করেন। কিন্তু বিচ্ছিন্নতাবাদী, দেশবিরোধী এবং বৈদেশিক শক্তির দালালদের কাছে "সঙ্ঘ বিচার পরিবার", এক ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সমস্ত সংগঠনগুলো আমাদের দলের অংশ নয়। কিন্তু আমাদের দলও এই সমস্ত সংগঠনগুলো যে আদর্শবাদ নিয়ে চলে সেই আদর্শবাদের অংশীদার। আমাদের সবাইকার একই অনুপ্রেরণা "ভারতমাতা কী জয়" এবং "বন্দে মাতরম"।

সঙ্ঘ আদর্শে অনুপ্রাণিত বিবিধ সংগঠন

অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ — সর্ববৃহৎ ছাত্র সংগঠন, সদস্য সংখ্যা ১৭,১৭,০০০। দেশের ৪৬৮২টি কলেজে বিদ্যার্থী পরিষদের শাখা আছে। দেশের মধ্যে এমাগত বাংলাদেশী মুসলিম অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে পরিষদ সর্বদাই সজাগ। সারা দেশে দুর্নীতির বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজকে সংগঠিত করে আন্দোলন শুরু করেছে পরিষদ।

বিদ্যাভারতী — ভারতীয় সংস্কৃতি ও জীবনাদর্শের অনুকূল শিক্ষা ব্যবস্থা ও তার যোগ্য বিকাশ করা। শিশু, বালকদের মধ্যে শারীরিক, মানসিক, বৌদ্ধিক, আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক বিকাশের ব্যবস্থা করে রাষ্ট্রভক্ত আদর্শ নাগরিক নির্মাণ করাই বিদ্যাভারতীর প্রকৃত লক্ষ্য। বর্তমানে সারা দেশে বিদ্যাভারতী পরিচালিত ২২,৮২৮টি বিদ্যালয় আছে। ছাত্র সংখ্যা ৩০,৫১,১১৫ এবং ১৩৫৩৩৩ জন শিক্ষক শিক্ষিকা রয়েছেন। আবাসিক বিদ্যালয় : বালক - ১২৭, বালিকা - ১৯ এবং সহ-শিক্ষা - ৩৯। সুদূর জম্মু, লাদাখ, অরুণাচলের দুর্গম অঞ্চলে বিদ্যাভারতী পরিচালিত বিদ্যালয় চলছে।

শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ — প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সমস্ত স্তরের শিক্ষক ও শিক্ষকর্মীদের সংগঠন। ২৩ টি রাজ্যে সদস্য সংখ্যা ৮ লক্ষ।

ভারতীয় শিক্ষণ মণ্ডল— শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয় ও শিক্ষার উন্নতির জন্য কর্মরত। দশ হাজার বার্ষিক সদস্য সহ ২৪টি প্রদেশে খুখী সমিতি আছে।

শিক্ষা বাঁচাও সমিতি — শিক্ষা বাঁচাও সমিতি হল এক আন্দোলন। শিক্ষার বিকৃতি দূর করে এক আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থা স্থাপনা করাই উদ্দেশ্য। সেক্স-এডুকেশনের পরিবর্তে চরিত্র নির্মাণের শিক্ষার দাবি জানাচ্ছে।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ — এই মুহূর্তে সমগ্র দেশে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ৭৬৫৭৬টি সমিতি রয়েছে। সংসঙ্গ ৩৩, ৫৯৭, এছাড়া বজরঙ্গ দলের ৫৯০০২টি মাতৃশক্তি ৬৭৬৪টি, দুর্গা বাহিনীর ৩২৬১টি শাখা আছে। আজ পর্যন্ত প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ স্বধর্মে ফিরেছে পরিষদের প্রচেষ্টায়। পরিষদের তত্ত্বাবধানে ৬৬১টি গো-শালা ও ২২১টি পঞ্চ গব্য কেন্দ্র চলছে। এবছর থেকে সমস্ত তীর্থকেন্দ্রে যাত্রীদের বিবিধপ্রকার সহায়তা দেবার জন্য 'হিন্দু হেল্প লাইন' করেছে সংগঠনটি।

বনবাসী কল্যাণ আশ্রম— দেশের মোট ৩৫১টি বনবাসী অধ্যুষিত জেলার (যেখানে ২৫ শতাংশ বনবাসী থাকে) মধ্যে বেশিরভাগ জেলাতেই কাজ আছে। ১৪২৫৩ স্থানে সেবা ও জাগরণের কাজ চলছে।

ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ— ৪৯৫০টি ইউনিট এবং সদস্য সংখ্যা প্রায় ৯২ লক্ষ। অসংগঠিত মজদুর ক্ষেত্রে দ্রুত কাজ বৃদ্ধি করার চেষ্টা হচ্ছে। শ্রমিকদের দাবি পূরণের জন্য জেল-ভরো আন্দোলন হয়েছে। বিশ্বকর্মা পূজার দিন শ্রমিক দিবস পালন করা হয়। ভারত সরকার কর্তৃক স্বীকৃত বৃহত্তম শ্রমিক সংগঠন।

ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘ— সমস্ত প্রদেশে কিষাণ সঙ্ঘের প্রাদেশিক সমিতি আছে। কিষাণ সঙ্ঘ কৃষির দেবতা বলরামের জন্মতিথিকে কৃষিদিবস হিসাবে পালন করে থাকে। সদস্য সংখ্যা ১৩ লক্ষ।

বিবেকানন্দ কেন্দ্র, কন্যাকুমারী— ১৯৬৩ সালে স্বর্গীয় একনাথ রাণাডের দ্বারা কন্যাকুমারীতে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, দেশে বিদেশে আজ তার শাখা বিস্তারিত হয়েছে।

দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে বিবেকানন্দ কেন্দ্রের কাজ দ্রুত বিস্তার লাভ করছে।

ভারত বিকাশ পরিষদ— সম্পর্ক, সহযোগ, সংস্কার, সেবা ও সমর্পণ— এই পাঁচ সূত্র নিয়ে দেশের সম্পন্ন ও উচ্চশিক্ষিত বর্গের মধ্যে ভারত বিকাশ পরিষদ কাজ করছে। বর্তমানে দেশের ২৮২টি জেলায় ১০৬০টি শাখা আছে। সদস্য সংখ্যা ৪২,৫১০। গত বছর রাষ্ট্রীয় জ্ঞান প্রতিযোগিতায় চার হাজার বিদ্যালয়ের ৩৫ হাজার ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেছে। সংস্কৃত সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় ১৭০০ স্কুলের ১৫ হাজার বিদ্যার্থীর অংশগ্রহণ এবং 'ভারতকে জানো' প্রতিযোগিতায় ৬৫৫১টি স্কুলের ৮ লক্ষ বিদ্যার্থী অংশগ্রহণ করেছে। ১,০৫০০০ পুস্তক ছাত্রছাত্রীরা ক্রয় করেছে।

স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ — আর্থিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এক জন-আন্দোলন। ঝাড়খণ্ডের একটি খণ্ডে ৩২২টি গ্রামের সবক'টিতে মঞ্চের কাজ রয়েছে। সুরক্ষিত ভারত, সমৃদ্ধ ভারত — এই লক্ষ্যে বিভিন্ন স্থানে যুব সম্মেলনের আয়োজন করেছে।

ভারতীয় জনতা পার্টি— ১১ কোটি সদস্য সহ বি. জে. পি বিশ্বের প্রধান রাজনৈতিক দলের মর্যাদা পেয়েছে।

অখিল ভারতীয় গ্রাহক পঞ্চায়েত— 'রাষ্ট্রহিত গ্রাহকহিত' গ্রাহকদের মধ্যে এই চেতনা ও সংগঠন নির্মাণের জন্য কাজ করে চলেছে।

লঘু উদ্যোগ ভারতী— ভারতীয় জীবনে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলির নির্মাণের জন্য প্রতিষ্ঠিত ছোট ছোট শিল্পগুলির সমস্যা দূর করে তাদের সফল ও স্বাবলম্বী করার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত লঘু উদ্যোগের ক্ষেত্রে একমাত্র রাষ্ট্রীয় সংগঠন।

সহকার ভারতী— নির্মাতা, বিক্রেতা ও ক্রেতার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে সহযোগিতার দ্বারা অর্থ ব্যবস্থাকে বলিষ্ঠ করা যাদের উদ্দেশ্য। দেশের ২১২টি জেলা কার্যযুক্ত। সদস্য সংখ্যা ২৫ হাজারের কিছু বেশি।

অখিল ভারতীয় অধিবক্তা পরিষদ — দেশের বিচার পদ্ধতিকে ভারতীয় সংস্কৃতির অনুরূপ পরিবর্তন করার জন্য ব্যবহারজীবীদের নিয়ে গঠিত সংগঠন। দেশের ২৪টি উচ্চ আদালতে ২৪টি ইউনিট আছে।

রাষ্ট্রীয় শিখ সঙ্গত — শিখ বন্ধুদের সংগঠিত করার জন্য এই সংগঠন। সমস্ত দেশে ২১৪টি শাখা ও আরও ৬১০টি স্থানে সম্পর্ক আছে।

রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি— বোনেদের মধ্যে রাষ্ট্রভক্তি প্রেরণা জাগানোর জন্য সংগঠনটির জন্ম। এই মুহূর্তে ৫৩৩৮টি শাখা ও ৭৪৯টি সেবা প্রকল্প রয়েছে সারা দেশে।

পূর্ব সৈনিক সেবা পরিষদ— ২৫০০-এরও বেশি যেখানে প্রাক্তন সৈনিক আছে, তেমন ২২৪টি জেলার মধ্যে ১২৮টি জেলায় সমিতি রয়েছে। সদস্য সংখ্যা ৩২

হাজার। প্রতি বছর ১৬ই ডিসেম্বর 'বিজয় দিবস' পালন ও ১৪ই এপ্রিল মৈনাং যাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।

হিন্দু জাগরণ মঞ্চ — জনজাগরণ কার্যক্রম, ধর্মান্তরণ রোধ, পরাবর্তন, বলপূর্বক ধর্মান্তরণের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য এই সংগঠন তৎপর।

সীমা জাগরণ মঞ্চ — যেসব প্রদেশের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সীমান্ত রয়েছে তার সবগুলিতে কাজ রয়েছে। অনুপ্রবেশের ফলে মোট ১৭টি প্রদেশ প্রভাবিত। সীমা চৌকিগুলিতে জওয়ানদের রাখীবন্ধন, শস্ত্রপূজন এবং সম্পর্ক অভিযান নিয়মিত হয়।

ধর্মজাগরণ সমন্বয়— জনজাতিদের স্বধর্মে পরাবর্তনের কাজে এই সংগঠন সাহায্য করে।

বিশ্ব বিভাগ— সমগ্র বিশ্বের ৫টি ক্ষেত্রের ৩৪টি দেশে হিন্দু স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ৫৩০টি শাখা চলছে। ফিনল্যাণ্ড ও উগাণ্ডায় নতুন শাখা সবে শুরু হয়েছে।

অখিল ভারতীয় সাহিত্য পরিষদ— সাহিত্য ক্ষেত্রে ভারতীয় অস্মিতা ও সাংস্কৃতিক চেতনা বজায় রাখা ও তাকে উৎসাহ দান করে রাষ্ট্রবাদী বিচারধারা দ্বারা পুষ্ট করার লক্ষ্যে ১৯৩৬ সালে সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়। অনেক উদীয়মান ও খ্যাতনামা সাহিত্যিক পরিষদের সঙ্গে যুক্ত আছেন।

সংস্কার ভারতী— প্রায় সমস্ত প্রদেশে সংস্কার ভারতীর প্রাদেশিক সমিতি আছে। পরাধীনতার সময় যে সমস্ত গানের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল, সেগুলি সংগ্রহ করে একটি সিডি তৈরি করা হয়েছে। আবহমান সারস্বত সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারে একটি অগ্রণী সংগঠন।

বিজ্ঞান ভারতী— ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও স্বদেশী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশের জন্য গঠিত বৈজ্ঞানিকদের সংগঠন। মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চায় প্রাথমিকতা দিতে ২২টি প্রদেশে সমিতি গঠিত হয়েছে।

সংস্কৃত ভারতী— দেবভাষা সংস্কৃতকে আবার জনগণের ভাষা করে তোলার লক্ষ্যে কৃতসঙ্কল্প। দশ দিবসীয় সম্ভাষণ বর্গের মাধ্যমে মাত্র ১০ দিনে সংস্কৃত বলার নিঃশুল্ক প্রশিক্ষণ দেয় সংস্কৃতভারতী। সারা বিশ্বে এর সংগঠন রয়েছে।

প্রজ্ঞা প্রবাহ— এক বৈচারিক আন্দোলন। পশ্চিমী ভোগবাদী বৈচারিক প্রভাব থেকে সমাজকে মুক্ত করার জন্য এবং ভারতীয় চিন্তন ও বিচারের প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজ জাগরণের কাজ করছে।

ভারতীয় ইতিহাস সংকলন যোজনা— বাবাসাহেব আপ্তে স্মারক সমিতি দ্বারা সঙ্কলিত 'ভারতীয় ইতিহাস সংকলন যোজনা' ভারতের গত ৫০০০ বছরের তথ্যসমৃদ্ধ ইতিহাসের খোঁজ ও গবেষণার কাজে লিপ্ত। আমাদের প্রাচীন কালগণনা ও সরস্বতী নদীর বিলুপ্ত প্রবাহের অনুসন্ধান এই সময় যোজনার বিশেষ কাজ।

রাষ্ট্রীয় সেবা ভারতী— সঙ্ঘ ও বিবিধ সংগঠনগুলির দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী (এন জি ও) সংগঠনগুলিকে একত্র করার কাজ সেবা ভারতী করছে। এই সময় মোট ১,৬২,৮৩৭টি সেবা প্রকল্প চলছে। তার মধ্যে শিক্ষা ৫৬,০৮৫, স্বাস্থ্য ৪১,৭০১, সামাজিক ২৫,৬৭০ এবং স্বাবলম্বন ৩৮,৩৮১।

আরোগ্য ভারতী— উদ্দেশ্য স্বাস্থ্য রক্ষা, স্বাস্থ্য রক্ষার প্রশিক্ষণ, বিদ্যালয়ে যোগ, আহার ইত্যাদির মাধ্যমে সুস্থ থাকার প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন।

সক্ষম — সমদৃষ্টি, ক্ষমতা বিকাশ ও অনুসন্ধান মণ্ডল। সংক্ষেপে 'সক্ষম'। 'নেত্র' (চোখ) কে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি ঘোষণার দাবি জানিয়েছে। এপর্যন্ত ৬৯৭জন নেত্রদান করেছেন। বিকলাঙ্গদের মধ্যে কাজ করার জন্য ও তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্বাবলম্বন ও সামাজিক পুনর্বাসনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত সংগঠন।

দীনদয়াল শোধ সংস্থান— নানাজী দেশমুখ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত গ্রাম উন্নয়নের জন্য নিবেদিত সংস্থা। চিত্রকূট ক্ষেত্রে ৫০০ গ্রামের পরিবর্তন সকলকে বিস্মিত করেছে। বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গবেষণার জন্য ছাত্রছাত্রীরা নিয়মিত দীনদয়াল শোধ সংস্থানে এসে থাকে।

ভারতীয় হোমিওপ্যাথিক সমাজ— হোমিওপ্যাথি ডাক্তার, ছাত্র ও শুভানুধ্যায়ীদের মিলিত জনকল্যাণমূলক সংস্থা। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার গ্রামাঞ্চলে অত্যন্ত কম খরচে বা বিনাখরচে রোগীদের চিকিৎসার জন্য সংস্থার ডাক্তার ও কর্মীরা সদা প্রস্তুত।

ক্রীড়া ভারতী— ভারতীয় খেলা, ভারতীয় ব্যায়াম ও তার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় চরিত্র নির্মাণ। সব ক্রীড়া সংগঠনগুলির সমন্বয় করা। বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত যার মধ্যে একটি সূর্য নমস্কার বিভাগ।

বিশ্ব সংবাদ কেন্দ্র — প্রায় প্রত্যেক রাজ্যের রাজধানীতে বিশ্ব সংবাদ কেন্দ্রের কার্যালয় আছে। বিভিন্ন রাজ্যের খবর আদান-প্রদান করে তা স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে পরিবেশন করা ও জাতীয়তাবাদী সাংবাদিকতায় উৎসাহ প্রদান করা এবং জাতীয়তাবাদী সাংবাদিক নির্মাণ করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত।

সংকল্প— আই এ এস এবং আই পি এস-এর মতো প্রশাসনিক সেবায় যাতে গরীব মেধাবী ছাত্ররাও অংশ নিতে পারে সেজন্য স্বল্প খরচে প্রশিক্ষণ দেয় সংকল্প। সফলতার ক্ষেত্রে সংগঠনটির সাফল্যের হার চোখ ধাঁধানো।

তথ্যসূত্র : *www.rssomet.org*

গত দুই বছরে কেন্দ্রীয় সরকারের উপলব্ধি

নরেন্দ্র মোদিজীর নেতৃত্বাধীন বি.জে.পি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়ন কর্মধারা ঃ

মোদী সরকারের একটি স্লোগান 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ' সবাইকে সাথে নিয়ে সবার উন্নতি, যাতে কোনো ধর্ম বা জাতির ভেদাভেদ নেই। সরকারের কাজ তিনটি বিশ্বাস বা স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছে।

১। কল্যাণ, ২। সুরক্ষা, ৩। সম্মান

মানুষের কল্যাণের ও সামাজিক নিরাপত্তার জন্য গৃহীত জনসুরক্ষা প্রকল্প ঃ

* **প্রধানমন্ত্রী জনধন প্রকল্প** ঃ বিনা পয়সায় ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট, Debit Card, সহজে ছোট ঋণ, ৩০ হাজার টাকা সাধারণ বীমা, ১ লক্ষ টাকা দুর্ঘটনা বীমা, পশ্চিমবঙ্গে আজ অবধি মোট অ্যাকাউন্ট এক কোটি আশি লক্ষ ও মোট জমা চার হাজার কোটি টাকার বেশী।
* **প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বীমা যোজনা** ঃ বাৎসরিক ১২ টাকা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে বীমা করলে দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু বা অঙ্গহানী হলে ২ লক্ষ টাকা বীমা পাবে। আজ অবধি গ্রামে প্রায় ৫ কোটি শহরে প্রায় ৪.৫ কোটি মোট প্রায় ৯.৫ কোটি জন বীমা করেছেন।
* **প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বীমা যোজনা** ঃ বাৎসরিক ৩৩০ টাকার মাধ্যমে দু লক্ষ টাকার সাধারণ বীমা, আজ অবধি সাড়ে বারো কোটি মানুষ এই বীমার অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।
* **অটল পেনশন যোজনা** ঃ
* অসহায়দের জন্য Employment Talent Utilisation (সেতু) ও Atal Invention Mission (AIM)

মুদ্রা ব্যাঙ্ক ঃ

দরিদ্র, নিম্নবিত্ত, ছোট ব্যবসায়ী, বেকার যুবক-যুবতীদের ব্যবসায় মূলধনের জন্য মুদ্রা ব্যাঙ্ক যার মাধ্যমে দশ হাজার টাকা থেকে দশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ পাওয়া যেতে পারে। এখনও পর্যন্ত কেবল মাত্র পশ্চিমবঙ্গেই সতেরো লক্ষের বেশী তরুণ/তরুণী এই ঋণ গ্রহণ করেছেন যার পরিমাণ পাঁচ হাজার কোটি টাকারও বেশী।

আমাদের কন্যা আমাদের গর্ব :

* ভাই বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও * সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা * মহিলাদের সুরক্ষার জন্য হিম্মত সেফটি অ্যাপ চালু করা * দিল্লী সহ সমস্ত কেন্দ্র শাসিত রাজ্যে পুলিশ বিভাগে ৩৩ শতাংশে মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ চালু করা।

আজকের যুবক আগামী দিনের ভবিষ্যৎ

* স্কিল ইন্ডিয়া : যুবক-যুবতীদের বিশেষ ট্রেনিং-এর মাধ্যমে দক্ষ ও শিক্ষিত করে তোলা। * প্রধানমন্ত্রী বিদ্যালক্ষ্মী কার্যক্রম : উচ্চ শিক্ষার জন্য * বিভিন্ন বিভাগে অনলাইন কোর্স ও ইন্যাশনাল লাইব্রেরী চালু করা * ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তির জন্য জাতীয় পোর্টাল তৈরী করা। * ৫টি নতুন আই.আই.টি ও ৬টি নতুন আই.আই.এম তৈরী করা * পণ্ডিত দীন দয়াল উপাধ্যায় শ্রমেব জয়তে প্রকল্প। * দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল যোজনা যার মাধ্যমে কুশল ভারত গড়া।

* জাতীয় দক্ষতা বৃদ্ধি মিশন * বিশেষ সক্ষমদের জন্য সুগম ভারত প্রকল্প

জয় জওয়ান, জয় কিশান, জয় বিজ্ঞান অটলজির স্লোগান বাস্তবায়নের জন্য

* সেনা বাহিনীতে এক পদ এক পেনসন নীতি চালু করা। * অত্যাধুনিক অস্ত্র ও যুদ্ধ বিমানসহ যাবতীয় যুদ্ধ সরঞ্জাম তাদের হাতে পৌঁছে দেওয়া।

অন্নদাতা সুখী তব এই ভাবনার প্রয়োগ

* প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসল নষ্টের ৫০ শতাংশে ক্ষতিপূরণ * কৃষি ঋণ পরিশোধের নিয়ম শিথিল * কিষাণ ক্রেডিট কার্ড ও কৃষি বীমা পূর্ণভাবে চালু করা * মাটি পরীক্ষার জন্য Soil Health Card (মাটির স্বাস্থ্য কার্ড) চালু করা। * প্রধানমন্ত্রী কৃষি ও সেচ প্রকল্প ও ১ লক্ষ সৌর পাম্প বসানো হয়েছে * গবাদি পশু প্রতিপালনে উৎসাহ দান করার জন্য 'জাতীয় গোকুল মিশন'। * ১০০ কোটি টাকা ব্যয়ে কিষাণ টিভি চালু করা * বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে 'রাষ্ট্রীয় আবিষ্কার অভিযান' * পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য মিশন * তপশিলিদের উন্নয়নের বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য ১০০ কোটি টাকা মঞ্জুর * তপশিলি উপজাতিদের ছাত্র-ছাত্রীদের হস্টেল, বৃত্তি চালু করা ও 'বন বন্ধু কল্যাণ' যোজনা * সংখ্যালঘুদের উন্নয়নের জন্য 'ওস্তাদ' প্রকল্প চালু করা

এবং ৮৬ লক্ষ সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান * শ্রমজীবি মানুষদের জন্য তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব অ্যাকাউন্ট চালু করা, ই.পি.এস এ নুন্যতম ১০০০ টাকা পেনশন চালু ও ইউনিভার্সাল অ্যাকাউন্ট নম্বর চালু করা।

সামাজিক ক্ষেত্রে ও দেশের সার্বিক উন্নতি সাধনে :

* স্বচ্ছ ভারত মিশন—সুস্থ ভারত, সবল ভারত, শিক্ষিত ভারত নির্মাণ। এই মিশনের মাধ্যমে সার্বজনিক ক্ষেত্র, বিদ্যালয়, প্রভৃতি জায়গায় এখন অবধি ৫৮ লক্ষ শৌচাগার নির্মিত হয়েছে। সকল গরিব পরিবারের প্রত্যেক পরিবারকে শৌচাগার তৈরির জন্য ১২,৫০০ টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। পয়ঃপ্রণালী ও আবর্জনা পরিষ্কার এবং এই আবর্জনা থেকে বিদ্যুৎ তৈরী প্রকল্পের জন্য সহযোগিতা করা হচ্ছে।
* নমামী গঙ্গে প্রকল্প : গঙ্গাকে দূষণমুক্ত করা ও শিল্প দূষণ নিয়ন্ত্রণ কাজ শুরু হয়েছে। প্রথম পর্যায়ের জন্য ২০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং গঙ্গার পাড় সৌন্দর্যায়নও এর মধ্যে পড়ছে।

দীনদয়াল উপাধ্যায় অন্ত্যোদয় যোজনা : এর মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া মানুষকে এগিয়ে আনার চেষ্টা চলছে।

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা :

এই যোজনা দ্বারা সকলের জন্য ঘর (প্রত্যেক পরিবারের জন্য আবাসের ব্যবস্থা করা।)

* দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রাম জ্যোতি যোজনা : প্রতি গ্রামে, প্রতি ঘরে ২৪ ঘন্টা বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার কাজ চলছে দ্রুত গতিতে।
* দেশের আর্থিক বিকাশের লক্ষ : মেক ইন ইন্ডিয়া : বিশ্বের সকল শিল্পপতিদের Manufacturing Sector-এ লগ্নির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, G.D.P. বৃদ্ধি ও বেকারদের হাতে কাজ পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা।
* ডিজিটাল ইন্ডিয়া : ১ লক্ষ কোটি টাকা মঞ্জুর। প্রতিক্ষেত্রে বৈদ্যুতিন ও ইন্টারনেট পরিষেবার মাধ্যমে প্রতি গ্রামে নাগরিক পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া।
* প্রতিটি সাংসদের গ্রামদত্তক এর মাধ্যমে আদর্শ গ্রাম গড়ে তোলা।
* অটল মিশন ফর রেজুভেনশন এন্ড আরবান ট্রান্সফরমেশন AMRUTB এর মাধ্যমে নগরোন্নয়ন ৯৮,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ।

* ২০টি স্মার্ট সিটি তৈরি।

* জল বিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরী ও পুরানোগুলির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি।

* L.P.G. Subsidy সরাসরি ক্রেতাকে পৌঁছে দেওয়া। প্রধানমন্ত্রির ডাকে সাড়া দিয়ে এক কোটির বেশী মানুষ Subsidy ত্যাগ করেছে। যা B.P.L. ভুক্ত মানুষকে দেওয়া হয়েছে।

* মিশন ইন্দ্রধনুষ প্রকল্প ঃ এর মাধ্যমে ৭টি জীবনদায়ী রোগের বিনা পয়সায় Vaccition চলছে। জীবনদায়ী ঔষধের দাম নিয়ন্ত্রন করা হয়েছে।

* ছিট মহল বিনিময়

* উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হওয়া, উদ্বাস্তুদের নির্ভয়ে দেশে থাকার ব্যবস্থা করা ও গেজেট নোটিফিকেশন জারী করা।

* ২টি নতুন বিমানবন্দর চালু ও ৬টি নতুন তৈরী করা।

* G.D.P. বৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতি হার নিম্নমুখী করা।

* 'সাগরমালা' প্রকল্পের মাধ্যমে বন্দর এর উন্নয়ন ঘটানো ও নতুন বন্দর নির্মাণ।

* যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য ২০১৪ ২০১৫ সালে ২৮,৮৮১ কোটি টাকা বরাদ্দ, প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনার মাধ্যমে গড়ে প্রতিদিন ২০ কিমি. রাস্তা তৈরী।

* স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন প্রদান। * উত্তরবঙ্গে চাবাগান অধিগ্রহণ

* ২০৪টি কয়লা ব্লকের মধ্যে ৬৭টি মাত্র পুনঃবন্টন হয়েছে। তাতে ৫ লক্ষ ৩৫ হাজার কোটি টাকা দেশের অতিরিক্ত আয় হয়েছে।

* নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর অন্তর্ধান সম্বন্ধে ফাইল প্রকাশ

(১) প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা। (২) মেক্ ইন ইন্ডিয়া। (৩) স্বর্ণ মুদ্রায়ণ স্কীম। (৪) নীতি আয়োগ। (৫) প্রগতি প্লাটফর্ম। (৬) জাতীয় আয়রন ডেভেলপমেন্ট মিশন। (৭) গরীব কল্যাণ স্কীম। (৮) স্কুল নসরি যোজনা। (৯) স্ট্যান্ড আপ্ ইন্ডিয়া লোন স্কীম। (১০) রাণী লক্ষীবাই পেনশন স্কীম। (১১) স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া (১২) কৃষি বিমা যোজনা। (১৩) হৃদয় যোজনা (Hriday)। (১৪) ইন্দ্রধনুষ (Indra Dhanush)। (১৫) স্বদেশ দর্শন। (১৬) প্রসাদ (Prasad)। (১৭) মহাত্মা গান্ধি প্রবাসী সুরক্ষা স্কীম (যোজনা)।

* সর্বোপরি সারা পৃথিবীতে ভারতের সম্মান ও গৌরব বৃদ্ধি।

আমাদের কার্যপদ্ধতি

আমাদের কাজ এক ব্যাপক রাষ্ট্রীয় বিচার পরিবারের অঙ্গ, "We are part of wider national school of thought".

১৯৫১ থেকে আজ পর্যন্ত আমরা যে লাগাতার সামনে এগিয়েছি তার তিনটি প্রধান কারণ -

১. আমাদের বিচার ধারা - (Our Ideology)

২. আমাদের কার্যপদ্ধতি - (Our working system)

৩. অখিল ভারতীয় সংগঠন নির্মাণের নিরন্তর প্রয়াস। (Continuous Effort for All India organization structure."

এই তিনটির উপর নির্ভর করে মাঝে মাঝেই দেশের সামনে যে Challenge (বিপদ) এসেছে আমরা তার মোকাবিলা করেছি, একই সঙ্গে একটি প্রধান রাজনৈতিক দল হিসাবে নিজেদের ভূমিকা সঠিক ভাবে পালন করেছি। অনেক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক, সামাজিক বিষয়ে আন্দোলন, সফল জনজাগরণ এবং আরও বহু প্রকার কার্যক্রমের মাধ্যমে আমরা আজকের অবস্থায় পৌঁছাতে পেরেছি।

আমাদের কার্যপদ্ধতি একটি বিশেষ ধরণের। (Working system) এই কার্যপদ্ধতি বুঝতে গেলে এর দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় (facts) বোঝা জরুরী।

কার্যপদ্ধতির দুটি দিক -

১. পারস্পরিকতা (Belongingness) We Feelings এই ভাব অর্থাৎ Mutuality.

২. সামূহিকতা (Collectivity)

সংগঠনকে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছাবার ভিত্তি হল এই অদ্বিতীয় কার্যপদ্ধতি, একথা সর্বদা মনে রাখতে হবে। পারস্পরিকতার এবং সামূহিকতার আধারেই Team ভাবনা নির্মাণ হয় যা আমাদের কার্যপদ্ধতির মূল আধার।

কার্যপদ্ধতির এই বিষয়টি দেখা যায় না- (visible নয়) কিন্তু এর আধারেই শক্তিশালী সংগঠন নির্মাণ সম্ভব। আমরা যখন কার্য পদ্ধতি নিয়ে চর্চা করছি তখন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে হবে

বার্তালাপ (Dialogue) নিজেদের মধ্যে কথা-বার্তা বা ভাবনার আদান প্রদান ও বিচার বিশ্লেষণ।

বার্তালাপ - Team ভাবনার প্রাণস্বরূপ। এটাকে বোঝা ও সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহারের মধ্যে নিয়ে আসা সংগঠনের জন্য অতি আবশ্যক। বার্তালাপ আমি শুরু করব নাকি অন্য কেউ শুরু করবেন, তার জন্য কি অপেক্ষা করব? বার্তালাপ শুরু হলে নিজে নিজেই বাড়তে থাকে যা কাজের জন্য উপযোগী হয়।

বার্তালাপ প্রাসঙ্গিক হোক এটাই কাম্য।

কার্যপদ্ধতির সঙ্গে জুড়ে থাকা একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র যা সমস্ত রাজনৈতিক দলেই অত্যন্ত জরুরী তা হল - নির্ণয় প্রক্রিয়া (Decision Making Mechanism)।

প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় স্তর পর্যন্ত এই নির্ণয় প্রক্রিয়া আমাদের কাজকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করে।

নির্ণয় প্রক্রিয়ার জন্য সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন। যাদের উপর নির্ণয় করার বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব রয়েছে তাদের সকলের। নির্ণয় সুষ্ঠ ভাবে ও পরিণাম কারক হোক এটাও দেখা জরুরী।

এই কারণে, কার্যকর্তা নির্ণয় প্রক্রিয়ার মধ্যে জড়িত থাকার (involvement) কারণে সেই সমস্ত বিষয় গুলি নিজের বলে মনে করবে কারণ নির্ণয় প্রক্রিয়ার তার ভাগ রয়েছে।

নির্ণয় প্রক্রিয়ার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে। সার্থক (meaningful) এবং যথেষ্ট চর্চা (sufficient discussion) যেখানে নির্ণয় বা সিদ্ধান্ত সকলে স্বীকার করবে। কার্যপদ্ধতির অন্য আরও গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে যার অন্যতম হল নিয়মিত শ্রেণী বৈঠক। (Regular category wise meetings.)

আমাদের কাজে বৈঠকের একটি অসাধারণ গুরুত্ব আছে। অঞ্চল কমিটি থেকে শুরু করে রাজ্য কমিটি পর্যন্ত, বিধায়ক (M.L.A) দলের বৈঠক, সংসদীয় (M.P.) দলের বৈঠক, নূতন ভোটারদের বৈঠক, সমীক্ষা বৈঠক, এই ভাবে বহু প্রকারের বৈঠক আছে। সম্ভবত এমন রাজনৈতিক দল কমই আছে যেখানে নিরন্তর বহু প্রকারের বৈঠকের ব্যবস্থা হয় বা আমাদের নিয়মিত হয়ে থাকে। বৈঠক পূর্ব নির্ধারিত হবে, সকলের কাছে পূর্বেই সূচনা থাকবে, বৈঠকের আলোচ্য বিষয় সকলের জানা থাকবে। বৈঠকের স্থান, সময়, কতক্ষণের বৈঠক, বৈঠকের পরিবেশ, সকলের অংশগ্রহণ, বৈঠকের অনুবর্তন (follow up) এই সমস্ত বিষয় গুলির উপর বিশেষ ভাবে নজর দেওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। বৈঠক সুষ্ঠ পরিবেশে হোক, পরিণামকারক বা ফলপ্রসূ হোক এদিকেও নজর দিতে হবে।

কার্যপদ্ধতির আরও একটি দিক হল কার্যকর্তা বিকাশের চিন্তা বা আগামী দিনের জন্য কার্যকর্তা নির্মাণের চিন্তা। কার্যকর্তার বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য করা। কার্যকর্তার বিকাশের সাথে সাথে তাকে সঠিক পথে রাখা এ বিষয়েও বিশেষভাবে চিন্তা করতে হবে। কার্যকর্তাকে কাজ দিয়ে পরীক্ষা নেওয়া ও লক্ষ্য (observe) রাখা তার অভিজ্ঞতা বাড়ুক, আত্মবিশ্বাস বাড়ুক, এদিকেও তীক্ষ্ণ নজর দিতে হবে।

কার্যকর্তার বিকাশ, তাকে সঠিক দিশা দেওয়া, মাঝে মাঝে কার্যকর্তার প্রশিক্ষণ, বিষয় অনুসারে, স্তর অনুসারে হওয়া আবশ্যক।

যুগানুকূল চিন্তন - এটাও আমাদের কার্যপদ্ধতির অঙ্গ। নতুন নতুন প্রয়োগ করা, আধুনিক নতুন উপকরণের প্রয়োগ, নতুন নতুন বিষয় পার্টিতে যুক্ত করাও গুরুত্বপূর্ণ। আমরা জীবন্ত-চলমান জীব। (Living organization) এই কারণে সময়ানুকূল পরিবর্তন প্রয়োজনীয়, যেখানে নূতন নূতন বিষয় প্রয়োগ (freshness) হতে থাকবে এবং নিত্য নতুন যৌবন যুক্ত হতে থাকবে।

Share and care এটি সমূহিকতার জন্য জরুরী। Sharing তো খুব সহজেই হতে থাকে কিন্তু একই সাথে Caring ও হওয়া চাই।

'আমিই ঠিক' এই মানসিকতা একদমই ঠিক নয়। অন্য কেউ বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারে, অন্য কেউ উপযোগী হতে পারে, অন্য কেউও পার্টিতে নতুন কিছু করে দেখাতে পারে এমন একটি বিশ্বাসের পরিবেশ নির্মাণ করতে হবে। বর্দ্ধিত কার্যপদ্ধতির দৃষ্টিতে যা অত্যন্ত আবশ্যক।

Exchange of note অর্থাৎ Sharing

- কাজের বিভাজন, সময় মত কাজটি হওয়া, কাজটি হবার পর তার সমীক্ষা (Review) করা যেগুলির অনুবর্তন (Follow up) প্রয়োজন তা সম্পূর্ণ করা, এগুলি গুরুত্বপূর্ণ।
- সবসময় মনে রাখতে হবে আমাদের মধ্যে কেউ সম্পূর্ণ নয় (Complete entity)
- আমরা সকলে অপূর্ণ কিন্তু সকলে মিলে পূর্ণ হবার চেষ্টা করতে পারি। এই ভাবটি কার্যপদ্ধতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
- One for all, all for one.
- All are important but nobody is indispensible. (সকলেই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু কেউ অপরিহার্য নয়)।

- "সমস্ত কার্যকর্তার জন্য কাজ" "সব কাজের জন্য কার্যকর্তা"।
- পূর্ব যোজনা পূর্ণ যোজনা (Planning in Advance, Planning in Detail) বার্তালাপ, সমীক্ষা, চর্চা, বৈঠক, নির্ণয় প্রক্রিয়া, কার্যকর্তা বিকাশ, তাকে ঠিক ভাবে রাস্তা দেখান, প্রশিক্ষন, প্রবাস, পরীক্ষা নেওয়া, ভুল করলে তা স্বীকার করা, Long rope দেওয়া কিন্তু no full stop, নিরন্তর প্রগতি করা, বিকাশ ঘটিয়ে এগিয়ে চলার অবিরত চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া এগুলি কার্যপদ্ধতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ।
- নিজেদের ক্ষেত্রে কাঠোরতা কিন্তু অন্যদের ক্ষেত্রে উদারতা বা ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখার মত মানসিকতা থাকা জরুরী।
- সামূহিকতা এবং পারস্পরিকতার আধারে 'ব্যক্তি নির্মাণ থেকে রাষ্ট্র নির্মাণের' প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যা বি জে পি-র কাজের বিকাশ ও বিস্তারের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়।

সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রবাদ

সংস্কৃতির মধ্যেই রাষ্ট্রের অধিষ্ঠান।

ভারতীয় সংস্কৃতি ভূমিকে মাতা এবং জনগণকে ভূমির সন্তান হিসেবে দেখে। "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী", "মাতা ভূমি: পুত্রো অহম্ পৃথিব্যা:"।

ইউরোপীয়রা ভূমিকে পিতা বলে মানে ফলে দেশে তাদের কাছে পিতৃভূমি।

ভোগবাদী মানুষ যারা নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ বলেন তাঁরা পৃথিবীকে ভোগভূমি হিসেবে বিশ্বাস করেন।

আমাদের জাতীয়তাবাদের উৎস, "ভারতমাতা কী জয়"।

বৈদিক মন্ত্র "মাতা ভূমি: পুত্রো অহম্ পৃথব্যা:" শ্লোকের আধুনিক শব্দার্থ "বন্দেমাতরম্"।

ভারতবর্ষ পৃথিবীর প্রাচীনতম রাষ্ট্র।

"ভদ্রং ইচ্ছন্ত: ঋষয়: স্বর্বিদ:
তপো দীক্ষাং উপাসেদুরগ্রে
ততো রাষ্ট্রম্বল ওজশ্চজাতম
তদস্মৈ দেবা উপহরং নমন্তু।। (অথর্ব বেদ)

আমাদের আত্মবিস্মৃত করবার জন্যে ইংরেজরা প্রচার করলেন আমরা কখনই

রাষ্ট্র ছিলাম না। ভারত কখনই একটা দেশ ছিল না, এটি একটি বহুভাষিক, বহুধর্মবিশিষ্ট, বহুসাংস্কৃতিক উপমহাদেশ।

ভারতবর্ষের প্রতি ইংরেজদের অপপ্রচার, "ভারতবর্ষে আর্যদের আক্রমণ"। এর জবাবে ডঃ আম্বেদকর বলেন, 'ঋগ্বেদে যে ভাষায় সপ্তসিন্ধুর উল্লেখ করা হয়েছে এটি উল্লেখনীয়। কোনও বিদেশী কখনও একটি নদীকে "আমার গঙ্গা, আমার যমুনা, আমার সরস্বতী" বলে আপন করা সম্বোধনে অভিহিত করবে না, যদি না তার সম্পর্কে তার মানসিক দুর্বলতা থাকে। ঋগ্বেদের এই বক্তব্যের পর আর্যরা বাইরে থেকে এসে অনার্য দাসেদের যুদ্ধে পরাজিত করেছে, এই বক্তব্য হাস্যকর হয়ে পড়ে।

এই ইউরোপীয় তত্ত্ব অবলম্বন করে বামপন্থীরা ভারতবর্ষকে বহুজাতিক রাষ্ট্র বলে অভিহিত করে। এর ফলে যখনই ইসলাম ধর্মের ভিত্তিতে দ্বিজাতিতত্ত্বের আওয়াজ উঠলো, কম্যুনিষ্টরা মুসলীম লীগের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেল।

ভারতবর্ষের অখণ্ড সংস্কৃতির ওপর ধর্মীয় এবং সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতির এই আঘাতের ফলে ভারতবর্ষেও দুর্ভাগ্যজনক বিভাজন ঘটে গেল।

জাতীয়তাবাদ

জাতীয়তাবাদের মূল হচ্ছে জনইচ্ছা—মাজিনি

জাতীয়তাবাদের মূলবস্তু— রাষ্ট্র হওয়ার ইচ্ছা—রেনান

জাতীয়তাবাদ একটি কর্পোরেট সেন্টিমেন্টের মত অনুভূতি, যারা যারা এর সঙ্গে জড়িত, তারা অনুভব করে তারা এর সাথে জড়িত এবং একাত্ম—আম্বেদকার

জাতীয়তাবাদ একটি ঐশ্বরিক আদর্শ যা মূলতঃ স্মৃতির এক মূল্যবান ইতিহাস এবং একত্র বসবাস করার প্রচণ্ড বাসনা থেকে জাত—আর্নেস্ট রেনান

পাশ্চাত্য জগত আমাদের "সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রবাদের" পরিবর্তে "নেশান ষ্টেট" এর ধারণা তুলে ধরলো, যার ফলস্বরূপ পৃথিবীকে দুটি ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী বিশ্বযুদ্ধ, উপনিবেশবাদ এবং ক্রমান্বয়ে সারা পৃথিবী জুড়ে চলতে থাকা হানাহানি দেখতে হলো।

এর মধ্যে থেকে সঞ্জাত ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক একাত্মতা এবং জাতীয়তাবাদ অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং কখনই ধ্বংসাত্মক নয়। আমাদের অখণ্ডতার উৎস অপরের সঙ্গে সংঘাত নয়। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে স্বাভাবিক জাতীয়তাবাদ এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে :

উত্তরম্ যৎ সমুদ্রস্য, হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্
বর্ষং তদ্ ভারতম্ নাম, ভারতী যত্র সন্ততি

"গঙ্গা চ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতী
নর্মদে সিন্ধু কাবেরী জলস্মিনসন্নিধিং কুরু।" (বিষ্ণুপুরাণ)

অখণ্ড ভারত

ভারতবর্ষ এক ভূ-সাংস্কৃতিক রাষ্ট্র, যাকে ধর্মের নামে বিভক্ত করা হয়েছে।

আমরা অখণ্ড ভারতের উপাসক। দীনদয়ালজী বলতেন, "অখণ্ড ভারত কোন রাজনৈতিক শ্লোগান নয়, এটি আমাদের বিশ্বাসের অঙ্গ"।

রাষ্ট্র-রাজ্যের ধারণা পশ্চিমী দুনিয়াকে বিভাজিত করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, সাকারাত্মক ইউরোপীয়ন জাতীয়তাবাদের স্রোত জোরদার হচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তিক্ত অভিজ্ঞতার পর, তারা এখন ইউরোপীয়ান সংসদ, ইউরোপীয়ান বাজার এবং ইউরোপীয়ান মুদ্রা তৈরী করছে। রাষ্ট্র-রাজ্যে অনুপ্রাণিত ইউরোপের সময় লাগবে ভূ-সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রে পরিবর্তিত হতে।

আরব জাতীয়তাবাদ এবং আফ্রিকান জাতীয়তাবাদের একই অবস্থা। এই জাতীয়তাবাদ এখনও ভূমিতে রূপ পায় নি, শুধুই শ্লোগানে আবদ্ধ। এক শক্তিশালী ভূ-সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ গঠনের পর ভারতবর্ষকে পৃথিবীর শান্তি বা বসুধৈব কুটুম্বকমের জন্য দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে হবে।

চিতি-রাষ্ট্রের আত্মা

রাষ্ট্রের আত্মাকে বলা হয় চিতি।

যেটা চিতির অনুকূল, সেটা শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সংস্কৃতি, যেটা চিতির প্রতিকূল সেটা খারাপ অর্থাৎ বিকৃতি।

এই চিতি জন্মগত এবং রাষ্ট্রের উত্থান এবং পতন নির্ভর করে চিতির উত্থান-পতনের ওপর। চিতিকে ভুলে গেলে আমরা অন্যের দাস হয়ে যাই এবং চিতিকে স্মরণে আনলে আবার স্বাধীনতা পাই।

ইকবাল লিখছেন "উনান, মিশ্র, রোমা, সব মিটগয়ে জাঁহা সে
কুছ বাত হ্যায় কি হস্তি মিটতি নহী হমারী।

সুস্থ সমাজের শক্তি—"বিরাট"

সুস্থ সমাজের শক্তিকে "বিরাট" বলে।

এটা সমাজের অন্তর্নিহিত এবং প্রতিরোধ শক্তি।

সমাজের সমস্ত অংশ 'বিরাট' থেকেই জন্ম নেয়।

পৃথক হওয়ার ইচ্ছা 'বিরাটকে' দুর্বল করে।

সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রের নিয়ামক শক্তি হচ্ছে 'চিতি' এবং 'বিরাট'।

জাগ্রত চিতি এবং শক্তিশালী বিরাট, রাষ্ট্রকে গঠন এবং সংবর্ধন করে।

স্বরাজ্য এবং সুরাজ্য

যদি সংস্কৃতির ধারণাই না থাকে, তাহলে স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিণতি হবে স্বার্থপর, ক্ষমতাপিপাসু সংগ্রাম। ক্ষমতার লোভ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের অভিমুখ ঘুরিয়ে দিয়েছিল, যার ফলে আমরা বিভাজিত হলাম। সাম্রাজ্যবাদী, রাষ্ট্রবাদী বিরোধীদের হাতে স্বদেশী ভাবনা পরিচালিত হল।

আমরা এক দেশ, এক জাতি, এক সংস্কৃতি।

ভারতীয় সংস্কৃতি "একম সৎ, বিপ্রা বহুধা বদন্তি", তত্ত্বের ওপর গঠিত।

এখানে বিবিধতা সমাজের নিয়ন্ত্রক শক্তি, বিভাজক শক্তি নয়।

সমস্ত জাতি, বর্ণ, ভাষা, কলা এবং সঙ্গীত এই একই সংস্কৃতির কথা বলে।

সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রবাদের ধারণা সম্পর্কে রাষ্ট্রনায়ক অটল বিহারী বাজপেয়ী ভারতভূমির বর্ণনা এভাবে করেন :

ভারত জমিন কা টুকরা নহী, জীতা জাগতা রাষ্ট্রপুরুষ হ্যায়।
হিমালয় ইসকা মস্তক এবং গৌরীশঙ্কর শিখর হ্যায়।
কাশ্মীর কিরীট হ্যায়, পঞ্জাব ঔর বঙ্গাল দো বিশাল কন্ধে হ্যায়।
বিন্ধ্যাচল কটি হ্যায় নর্মদা করধনী হ্যায়।
পূর্বী ঔর পশ্চিমী ঘাট, দো বিশাল জঙ্ঘায়ে হ্যায়।
কন্যাকুমারী ইসকে চরণ হ্যায় সাগর ইসকে পগ পখারতা হ্যায়
পাও কে তলে মেহ ইসকে কুন্তল কেশ হ্যায়।
চাঁদ ঔর সুরজ ইসকি আরতি উতারতে হ্যায়।
ইহ বন্দন কী ভূমি হ্যায়, অভিনন্দন কী ভূমি হ্যায়।
ইহ তর্পন কী ভূমি হ্যায়, ইহ অর্পণ কী ভূমি হ্যায়।
ইসকা কণ্ঠ কণ্ঠর শঙ্কর হ্যায়,
ইসকা বিন্দু-বিন্দু গঙ্গাজল হ্যায়।

মিশ্রিত সংস্কৃতির বিচার বিরাষ্ট্রবাদ এবং বহুরাষ্ট্রবাদকে পুষ্ট করে, সুতরাং এটা আমাদের ত্যাগ করতে হবে।

রসখান, আব্দুর রহিম খান-ই-খানান, মৌলানা দায়ুদ, কুতবন, মঞ্জন, মালিক মহম্মদ জয়সি, কাজী নজরুল ইসলাম এবং কবি মীর-তাকি-মীর মুসলিম সমাজের বিরাট ব্যক্তিত্ব যাঁরা ভারতবর্ষের অখণ্ডতার সংস্কৃতি বহন করে গেছেন।

আজকের যুগে বিচারপতি মহম্মদ করিম চাগলা, প্রয়াত রাষ্ট্রপতি এ.পি.জে. আব্দুল কালাম এবং মৌলানা ওয়াহিউদ্দীন উপরোক্ত একই সংস্কৃতির বাহক।

এই বিচার মানুষের অসমবদ্ধতা, পৃথকতা এবং দ্বন্দ্বশীলতার সম্পর্কগুলির বিনাশ ঘটায়।

একাত্মতা সমগ্রতার মধ্যে থাকে। সমগ্রতার অভাবে খণ্ডিত দৃষ্টির দ্বারা মানুষ আক্রান্ত হয়। যেমন ব্রহ্মাণ্ডে সমগ্রতা আছে তেমন ব্যক্তিতেও সমগ্রতা আছে। ব্যক্তি অর্থাৎ শুধু শরীর নয়, তার মধ্যে মন আছে, বুদ্ধি আছে, আত্মা আছে এর মধ্যে একটিরও উপেক্ষা ব্যক্তি অসুখী হয়। এই চারটির পৃথক পৃথক সুখ ব্যক্তিকে সুখী করে না, তার প্রয়োজন একাত্ম এবং ঘনীভূত সুখ, যার নাম আনন্দ।

তেমনই সমাজ কেবল সরকার নয়, তার নিজের সংস্কৃতি আছে, জনগণ এবং দেশ আছে, এই চারটির একসাথে সঞ্চালন ছাড়া সমষ্টির সুখের সন্ধান অসম্ভব।

এই প্রকার সৃষ্টির পঞ্চ মহাভূত (পৃথিবী, জল, আকাশ, প্রকাশ ও বায়ু) আছে, যার সাথে সংসঙ্গত ব্যবহার হওয়া উচিত। অদৃশ্য কিন্তু অনুভূতিতে সজাগ আধ্যাত্মিক তত্ত্বগুলির যোগ্য সাক্ষাৎকার হওয়া প্রয়োজন। তবেই মানুষ সুখী হবে।

ব্যষ্টি, সমষ্টি, সৃষ্টি ও পরমেষ্টির দ্বারা একাত্ম হওয়া মানুষই বিরাট পুরুষ, এর পুরুষার্থ চতুর্ভূমি অর্থাৎ 'ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ'। এই পুরুষার্থ মানুষের পরিস্থিতি নিরপেক্ষ প্রয়োজন, একে সম্পূর্ণ করা সমাজ ব্যবস্থার কাজ।

ধর্ম—অর্থাৎ "শিক্ষা—সংস্কৃতি এবং নিয়ম"।

অর্থ—অর্থাৎ পুরুষার্থ, ধর্মানুসার অর্থব্যবস্থা। (আর্থিক রোজগার, উৎপাদন, বণ্টন, এবং উপযোগ)

কাম—ধর্মবিরুদ্ধ কামহম্ (যা ধর্মের বিরুদ্ধে নয়, আমি সেই কাম —গীতা)

সমস্ত আকাঙ্ক্ষা এর অন্তর্গত। বিভিন্ন শিল্প ও কলার মাধ্যমে এই আকাঙ্ক্ষাগুলিকে সংস্কারাত্মক করে তোলা এই সংস্কৃতির লক্ষ্য। ধর্ম বিরুদ্ধ কাম পুরুষার্থ তো নয়ই বরং তাকে বিকার বলা যায়।

মোক্ষ—এ হল পরম পুরুষার্থ। যখন ব্যক্তি অভাব ও প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে যায় তখন তার আর কোনও চাহিদা থাকে না। অর্থাৎ "বিগতস্য কুণ্ঠব" অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ।

এই সমস্ত বিচার বিশ্লেষণ কেবলমাত্র বৌদ্ধিকের বিষয় না হয়ে রাষ্ট্রনীতি ও রাজনীতির বিষয় হওয়া জরুরী। এর আধারেই দেশের নীতি তৈরী হওয়া প্রয়োজন।

প্রশ্ন উত্তরে একাত্ম মানববাদ

১। একাত্ম মানববাদ কি?

উত্তর — 'একাত্ম মানববাদ' হল একটি বিচারধারা। পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় সমগ্র জগতের জন্য এই বিচারধারা ব্যক্ত করেছেন।

২। এই বিচারধারার বিশেষত্ব কি? কেনই বা সমগ্র মানব সমাজের জন্য তা প্রয়োজন?

উত্তর — ভারতের স্বাধীনতা লাভের সময় দেশের প্রগতির জন্য (১৯৪৭) ভারতের সামনে দুটি রাস্তা খোলা ছিল, প্রথম, পুঁজিবাদ এবং দ্বিতীয়টি সমাজবাদ। এই দুটি পথেরই উৎপত্তি হয়েছিল পাশ্চাত্য দেশে বা ইউরোপে। ঐ দেশগুলির সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিবেশে তাদের জন্ম ও বিকাশ হয়েছিল, কিন্তু ভারতের প্রাকৃতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক পরিবেশের জন্য কখনও তা উপযুক্ত ছিল না। বিশেষ করে যে বিচারধারার জন্ম ও তার বেড়ে ওঠার মধ্যে কোনো ভারতীয় নেই, ভারতীয়ত্ব নেই এবং যে বিচারধারা ভারতের সমাজে পরীক্ষিত নয়। দীনদয়ালজী বলেছেন, আমাদের নিজের দেশ, নিজের সংস্কৃতি ও ইতিহাস বিচার করে, নিজের দেশ ও বিশ্বের প্রয়োজন অনুসারে নিজেদের বিচারধারার বিকাশ ঘটাতে হবে। কাউকে নকল করে কখনও শ্রেষ্ঠ হওয়া যায় না।

৩। কিন্তু গান্ধীজী তো রামরাজ্য ও গ্রামরাজ্যের কথা বলতেন। পুঁজিবাদ ও সমাজবাদের কথা কেন এল?

উত্তর — একথা অতীব সত্যি যে গান্ধীজী রামরাজ্য ও পল্লী উন্নয়নের পক্ষে বলতেন এবং আমাদেরও সেই পথেই অগ্রসর হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরই গান্ধী ও তাঁর বিচারধারাকে ভুলে গিয়ে পাশ্চাত্যের অনুকরণ করা শুরু হল, পণ্ডিত দীনদয়ালজী যার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন।

৪। এই পুঁজিবাদ ও সমাজবাদ বিচারধারাগুলি কি ধরনের? দীনদয়ালজী কেনই বা এর বিরোধী ছিলেন?

উত্তর — প্রকৃতপক্ষে এই পুঁজিবাদ বাস্তবে হল ব্যক্তিবাদ। ইউরোপে ব্যক্তিবাদের বিরোধী ব্যক্তিরা একে পুঁজিবাদ নামে অভিহিত করেন। এই বিচারধারা মনে করে মানুষ কেবলমাত্র একজন 'ব্যক্তি'। এই বিচার সমাজের অস্তিত্বই স্বীকার করে না। ব্যক্তির স্বাধীনতাই মানুষের সুখের সমস্ত আধার বলে মনে করে এই বিচার। এর ফলে

স্বাধীন ব্যক্তি যখন শক্তিশালী হয়ে ওঠে ও দুর্বল মানুষের উপর অত্যাচার শুরু করে, তখন সমাজের মধ্যে বিষময় পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। সেই সময় কার্লমার্কস তার মতবাদ প্রকাশ করে বলেন, প্রকৃতপক্ষে মানুষ কোনো একক বা ব্যক্তি নয়, সে হল সমাজ। সমাজের মধ্যে সমানতা আনার জন্য ব্যক্তির স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। মানুষ কেবলমাত্র ব্যক্তি বা একক আবার মানুষ কোনো ব্যক্তি বা একক নয়, সে হল সমাজ— ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবীদের এই বিতর্কের মধ্যে বিকশিত হল পুঁজিবাদ ও সাম্যবাদ। এই দুটি বিচারধারাই জড়বাদী এই দুই মতবাদই আধ্যাত্মিকতার বিরোধী। এই দুটি মতবাদের জন্ম ও বিকাশ বিদেশে হয়েছে। এরা আধ্যাত্মবাদকে স্বীকারই করে না। তারা সম্পূর্ণরূপে জড়বাদী কিন্তু মানুষ কেবলমাত্র জড়বাদী হতে পারে না। তার পূর্ণ বিকাশের জন্য আধ্যাত্মবাদও একান্ত প্রয়োজন। এই বিচারধারা মানুষকে ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে বিভক্ত করে, বিচ্ছিন্ন করে। কিন্তু ব্যক্তি ও সমাজ আলাদা নয়, তা একে অন্যের পরিপূরক— এই কারণগুলির জন্যই দীনদয়ালজী এই বিচারগুলির বিরোধী ছিলেন।

৫। পণ্ডিত দীনদয়ালজী এই সমস্যা সমাধানের জন্য কি বলেছেন?

উত্তর — ভারতীয় পরম্পরা যা গান্ধীজীরও বক্তব্য ছিল সেই পরম্পরা কখনো ব্যক্তি বা সমাজকে বিভক্ত করে না, এবং মানুষকে কেবলমাত্র জড়বাদী বলে মনে করে না।

৬। তাহলে ভারতীয় পরম্পরা মানুষকে কি মনে করে?

উত্তর — ভারতীয় পরম্পরা মানুষকে 'একাত্ম' বলে মনে করে। একাত্ম অর্থাৎ যাকে বিভক্ত করা যায় না। যা ভাগ করা যায় না তাই 'একাত্ম'। সমাজ ও ব্যক্তি এমনভাবে যুক্ত যে তাদের আলাদা করা যায় না। মানুষ একজন ব্যক্তি হিসাবে সমাজের অভিন্ন অঙ্গ। আবার একজন ব্যক্তি তার পরিবার ছাড়া সম্পূর্ণ হতে পারে না। অন্যদিকে একটি পরিবার তার পাড়া, গ্রাম, শহর ছাড়া একাকী থাকতে পারে না। ঠিক সেইভাবে গ্রাম শহরের পরে দেশ ও বিশ্বের স্থান। ব্যক্তি এই প্রতিটি বিভাগের একটি অংশ, তার থেকে আলাদা নয়। 'একাত্ম মানবের' সুখ ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে বিভক্ত নয়, তা সম্পূর্ণরূপে একাত্ম।

৭। পুঁজিবাদী বা সমাজবাদীরা কি একথা স্বীকার করে না?

উত্তর — পুঁজিবাদী দার্শনিক সমাজকে বন্ধন বলে মনে করেন। ব্যক্তির স্বাধীনতার

পক্ষে ওকালতি করেন। আবার সাম্যবাদী বিচারক ব্যক্তিকে লোভী মনে করে, তাদের উপর সমাজের কঠোর নিয়ন্ত্রণের পক্ষে বলে থাকেন। পুঁজিবাদীরা বলে 'স্বাধীনতার মধ্যেই সুখ' আর সাম্যবাদীরা বলে, 'সুখের জন্য সমানতা অত্যন্ত জরুরি'। দীনদয়ালজী বলেছেন, মানুষের জন্য স্বাধীনতা ও সমানতা দুটোই একান্ত জরুরি। স্বাধীনতা ও সমানতা একে অন্যের বিরোধী একথা মনে করা ভুল। এ দুটি একে অন্যের পরিপূরক।

তিনি আরও বলেছেন, 'মানুষ কেবল ব্যক্তি বা সমাজের মধ্যেই একাত্ম নয়। এই সংসার অর্থাৎ প্রকৃতিরও অভিভাজ্য অঙ্গ। মানুষ যদি প্রকৃতির সঙ্গে নির্মম ব্যবহার করে বা প্রকৃতিকে শোষণ করে, তবে দুঃখ অনিবার্য। ভারতীয় পরম্পরা অনুসারে প্রকৃতি হল মাতৃস্বরূপা। প্রকৃতিকে নষ্ট করা, নোংরা করা বা ধ্বংস করা হল পাপ। এই সৃষ্টি কেবলমাত্র ব্যক্তি ও সমাজের কারণে তৈরি হয়নি। মানুষ কিভাবে প্রকৃতিকে ব্যবহার করবে তা শেখা একান্ত জরুরি। প্রকৃতির সঙ্গে তার ব্যবহার কিরূপ হবে মানব সুখের তাও এক মস্ত কারণ।

৮। একথা কি সত্যি যে ইউরোপীয় বিচারধারা একথা বিশ্বাস করে না?

উত্তর — ওরা প্রকৃতির উপর বিজয়ের বাসনা ব্যক্ত করে। তাকে নিয়ন্ত্রণের ইচ্ছা প্রকাশ করে। প্রকৃতির অনিয়ন্ত্রিত ভোগের কারণে তারা মানব সভ্যতার সামনেই এক সমস্যা তৈরি করেছে। জড়বাদ ও ভোগবাদ ওদের বিচারধারার মূল উৎস।

৯। এ ব্যাপারে ভারতীয় মত কি বলে?

উত্তর — দীনদয়ালজী বলতেন, 'ভারতবর্ষ একটি আধ্যাত্মিক তত্ত্বকে মানবতার অটুট অংশ বলে মনে করে। এটি একটি অনুভূতি। ভারত সেই পরমাত্মার কোনো একটি রূপ বা কোনো পূজা পদ্ধতির অনুসারী নয়। আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের জন্য বিভিন্ন পথের এখানে চর্চা হয়েছে, বিকাশ হয়েছে। এই কারণে সমস্ত প্রাণীর মধ্যে 'একই আত্মার বাস', 'জীবে দয়া পরম ধর্ম'র মত ভাবনা, 'অহিংসার' মতো গুণের বিকাশ এখানে হয়েছে। আধ্যাত্মিকতাই মানুষের একাত্মতার অংশ এবং তাকে অস্বীকার করার অর্থ বিপদকে ডেকে আনা একথা দীনদয়ালজী বিশ্বাস করতেন।

(একাত্ম মানববাদ পুরো জানতে বা বুঝতে হলে সম্পূর্ণ দীনদয়াল রচনা আমাদের পড়তে হবে।)

দেশের সামনে চ্যালেঞ্জ

- ভারতবর্ষ আজ আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক, এই দ্বিমুখী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন।

বৈদেশিক চ্যালেঞ্জ

- পাকিস্তান এবং চীন এই দুটি দেশের সঙ্গেই আমাদের সীমান্ত বিতর্ক রয়েছে এবং দুটি দেশই এই কারণে সীমান্তে এবং ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে ঝামেলা সৃষ্টি করে যাচ্ছে।
- এই দুটি দেশ পরমাণু শক্তিধর দেশ, একে অপরের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক রেখেছে একটি কারণে যাতে ভারতবর্ষ বিরাট শক্তিধর দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ না করতে পারে এবং ভারতের স্বার্থ যাতে বিঘ্নিত হয়।
- ভারতবর্ষ যেখানে প্রথম আণবিক বোমা ফেলবো না নীতি গ্রহণ করেছে, সেখানে এই দুটি দেশের কেউই সেই নীতি গ্রহণ করে নি।

পাকিস্তান ও চীন

- পাকিস্তানের মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদ ভারতবর্ষের বুকে আবার প্রাণ নিয়েছে এবং সারাদেশে জুড়ে কয়েকহাজার সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপ চালাচ্ছে। বিশ্বের অধিকাংশ দেশ পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদের উৎসমুখ বলে মেনে নিয়েছে এবং এই দেশটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সন্ত্রাস রপ্তানীকারক দেশ বলে পরিচিত। ভারত সীমান্তে অসংখ্য সন্ত্রাসবাদী শিবির চলছে। এছাড়াও ভারত থেকে পলাতক যেমন দাউদ ইব্রাহিমের আশ্রয়স্থলও পাকিস্তান। এই দেশ সবসময়েই শান্তি চুক্তি ভঙ্গ করছে এবং আবার আলোচনা টেবিলে বসে গালভরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে।
- ভারতবর্ষের জাতীয় সম্পদের একটা বড় অংশ ব্যয়িত হচ্ছে পাকিস্তান সমর্থিত জঙ্গী ক্রিয়াকলাপ প্রতিরোধ করতে।
- ভারতবর্ষ যদিও পাকিস্তানের প্রতি অর্থনৈতিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে এবং অত্যন্ত পছন্দের রাষ্ট্র (Most Favoured Nation)

ঘোষণা করেছে, পাকিস্তানের তরফ থেকে কোনও সহযোগিতা দূরে থাক, ভারতবর্ষকে পছন্দের রাষ্ট্র ঘোষণা করতেও রাজী নয়।

- ভারতবর্ষের সঙ্গে চীনের সীমানা নিয়ে বিবাদ বহুপুরোনো, অবিলম্বে মেটার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। ১৯৬২-র পর থেকে যদিও চীন সীমান্তে গুলিবর্ষণ কিংবা উত্তেজনা বৃদ্ধির বড় কোন ঘটনা নজরে আসেনি, তথাপি চীনের অস্ত্র প্রতিযোগিতা কিংবা সিকিউরিটি কাউন্সিলে পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দান যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ।
- চীনের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক আছে। কিন্তু ভারতকে অর্থনৈতিক, কূটনৈতিকভাবে এবং ভারতমহাসাগরীয় রাষ্ট্রসমূহের মাধ্যমে খাটো করার চেষ্টা করে যাচ্ছে।
- আরেকটি গভীর উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে চীনের নৌ শক্তি বৃদ্ধির দিকে বিশেষ ঝোঁক এবং ভারতের সামুদ্রিক ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করা।
- পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি রাষ্ট্রে সড়ক নির্মাণ করা এবং ভারত মহাসাগরীয় ক্ষেত্রে ভারতের আধিপত্য খর্ব করার চেষ্টা করছে চীন।
- বি.জে.পি কেন্দ্র ক্ষমতায় আসার পর ভারতবর্ষ নেপাল, ভুটান, মায়ানমার, বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কার সঙ্গে সচেতনভাবে সহযোগিতার হাত শক্ত করেছে। ভারত সরকার তার অনিষ্টকারী প্রতিবেশীদের কাছ থেকে যে বিপদ আসতে পারে সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন এবং গোয়েন্দা দপ্তরকে সম্পূর্ণভাবে সজাগ রেখে চলেছে।

আভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জ-মাওবাদী

- পাকিস্তান এবং চীনের ধারাবাহিক মদতপুষ্ট মাওবাদীরা ভারতের আভ্যন্তরীণ সুরক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্নস্থানে বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।
- মাওবাদী হামলার ফলে সারা দেশে হাজারের অধিক জওয়ান এবং নিরীহ নাগরিকের জীবন বলিদান হয়েছে। ফলে সারা দেশে প্রায় ২০০টি জেলায় এদের কার্যকলাপের কারণে উন্নয়ণের ধারা স্তব্ধ হয়ে গেছে।
- এই মাওবাদীরা এখন উত্তর-পূর্ব ভারতে উগ্রপন্থী দলগুলির সঙ্গে হাত মিলিয়ে বৃহত্তর হানার ছক কষছে।

- উত্তর পূর্ব ভারতের রাজ্য সমূহে সক্রিয় বিচ্ছিন্নতাবাদী দল সমূহ মায়ানমার এবং বাংলাদেশের গোপন আস্তানা থেকে ভারতবিরোধী কার্যকলাপ চালাচ্ছে এবং উগ্রবাদী হামলা পরিচালনা করছে।
- ২০১৫ জুলাইতে ভারতীয় সেনাবাহিনী উত্তরপূর্বের এই বিচ্ছিন্নতাবাদী দলগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয় এবং মায়ানমার পর্যন্ত ঢুকে গিয়ে তাদের উপযুক্ত জবাব দেয়, এদের সমস্ত ঘাঁটি ভেঙে চুরমার করে দেয়।

জবরদস্তি ধর্মান্তকরণ

- ভারতবর্ষের ধর্ম বর্ণ ভিত্তিক কাঠামোকে অর্থের জোগান দিয়ে নষ্ট করার জন্য ইসলামী জেহাদি এবং খৃষ্টীয় প্রয়াস দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে
- ভারতবর্ষের বাইরে বিদেশী এজেন্সির মুক্ত হস্তে অর্থ এবং বল প্রয়োগ করে ধর্মান্তরণ ঘটাচ্ছে, যেটা ভারতবর্ষের অন্যতম আভ্যন্তরীণ বিপদ।
- জোর করে ধর্মান্তকরণ এক চিন্তার বিষয়, কারণ এর ফলে আমাদের ভ্রাতৃত্ববোধ এবং সামাজিক সৌহার্দ্য নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।
- ধর্মান্তকরণ বিষয়টি রাজনৈতিক দিক দিয়েও অত্যন্ত সংবেদনশীল, কেননা এদেশের অধিকাংশ রাজনৈতিক দলগুলির হয় ধর্মান্তকরণ সমর্থন করে নয় চুপচাপ থাকা পছন্দ করে।
- কিছু রাজ্যে ধর্মান্তরণ প্রবলভাবে হয়েছে তার ফলে ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যাকে সম্পূর্ণভাবে বদলে দিয়ে নাগরিকদের মধ্যে ক্ষোভ এবং আক্রোশ জাগিয়ে তুলেছে, যে কোন সময়ে তা বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে।

আদর্শ স্বয়ংসেবক দীনদয়ালজী

শ্রীচরণেষু মামা,

আপনি আমাকে পুত্রের মতো পালন করেছেন ও শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। একজন পিতার মতোই আপনার এই ইচ্ছা নিতান্তই স্বাভাবিক যে আমি গৃহস্থ জীবনে প্রবেশ করি ও জীবিকা নির্বাহ করে পরিবারের দায়িত্ব গ্রহণ করি। কিন্তু মামা, আমি একটি অন্য পথ অনুসরণ করতে মনস্থ করেছি। নিজের নিজের পরিবারের ভাবনা তো সবাই করে, কিন্তু এই হিন্দু সমাজরূপী বিশাল পরিবারের চিন্তার জন্যও কিছু মানুষ দরকার। আমাদের এই সমাজের অবস্থা বর্তমানে সেই বিশাল জাহাজের মতো, যার সকল যাত্রী নিজ নিজ সম্পত্তি রক্ষায় ব্যস্ত, কিন্তু নীচের ছিদ্র দিয়ে যে জল ঢুকছে সেদিকে কারও নজর নেই। যদি এখনই এই ছিদ্রগুলি বন্ধ করার চেষ্টা না করা হয়, তবে জাহাজ একদিন অবশ্যই ডুববে। তখন সম্পত্তি ও সম্পত্তির মালিক কেউ বাঁচবে না। আমি আমার বুদ্ধি ও ক্ষমতা অনুসারে এই ছিদ্র মেরামতের যে মহাযজ্ঞ চলছে তাতে যোগ দিতে মনস্থ করেছি। ...

চিঠিটি ২১শে জুলাই ১৯৪২ সালে ২৫ বছরের এক যুবক লিখেছেন তাঁর অভিভাবক মামাকে। বাল্যকালেই তিনি হারিয়েছেন তাঁর মা-বাবাকে। অর্থাভাব, প্রতিকূল পরিস্থিতি কোনও কিছুই যাঁর অপূর্ব মেধাশক্তি ও অধ্যবসায়ের সামনে টিকতে পারেনি। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি ছাত্রবৃত্তি নিয়ে তিনি কানপুর থেকে বি.এ. পরীক্ষায় পাশ করেন প্রথম শ্রেণীতে।

১৯১৬ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর উত্তরপ্রদেশের মথুরা জেলার নাগলাচন্দ্রভান নামক গ্রামে পণ্ডিত ভগবতী প্রসাদ উপাধ্যায় ও শ্রীমতী রামপ্যারী দেবীর ঘরে জন্মগ্রহণ করেন দীন, একাত্মমানব দর্শনের প্রবক্তা পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়। ১৯৩৭ সালে সঙ্ঘের তরুণ প্রচারক ভাউরাও দেওরসের সঙ্গে পরিচয় ও সঙ্ঘে প্রবেশ। কথায় আছে, রতনে রতন চেনে। ভাউরাও-এর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের পর থেকেই বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে তাঁর। দুজনেই তরুণ, প্রতিভাধর, হৃদয়ে রাষ্ট্রের প্রতি সমান অনুভব তাঁদের বন্ধুত্বকে দৃঢ় করে তোলে। দীনদয়ালজী ও অন্যদের চেষ্টায় ১৯৩৮ সালে কানপুরে প্রথম শাখা শুরু হয়। সে বছরই দীনদয়ালজী নাগপুরে আয়োজিত সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গে যোগ দেন। তারপর একে একে দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গ শেষ হয়। তৃতীয় বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গে শারীরিক পরীক্ষায় দীনদয়ালজী অনুত্তীর্ণ হলেও বৌদ্ধিক পরীক্ষায় প্রথম হন।

১৯৪২ সালে এস টি-এর ডিগ্রি নেওয়ার পর তিনি প্রচারক জীবন শুরু করেন। তার ধ্যেয়নিষ্ঠা, সংগঠনকুশলতা ও বৌদ্ধিক ক্ষমতার জন্য যেখানেই তাঁকে পাঠানো হয়,

সেখানেই তিনি সফল হন। পরবর্তীকালে উত্তরপ্রদেশ প্রান্তের সহ প্রান্ত প্রচারকের দায়িত্বও তিনি পালন করেন।

দীনদয়ালজী ১৯৪৬ সালে লক্ষ্ণৌ থেকে 'রাষ্ট্রধর্ম' মাসিক ও 'পাঞ্চজন্য' সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রকাশ শুরু করেন। সঙ্ঘ ভাবধারাকে পত্রিকার মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার এটাই প্রথম প্রয়াস। তিনি 'সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত' ও 'জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য' নামক দুটি প্রেরণাদায়ী ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করেন।

১৯৫১ সালে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী জাতীয়তাবাদী, হিন্দুত্ববাদী দল গঠনের জন্য শ্রীগুরুজীর কাছে কয়েকজন কার্যকর্তা চান। শ্রীগুরুজী দীনদয়ালজীকে রাজনীতি ক্ষেত্রে কাজ করার জন্য পাঠান। তাঁকে উত্তরপ্রদেশের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তাঁর কার্যকুশলতা, সাংগঠনিক অনুশাসন, মৌলিক চিন্তন, প্রখর দূরদৃষ্টি ডঃ শ্যামাপ্রসাদকে এতটাই আকর্ষিত করে যে ১৯৫২ সালে কানপুরে জনসংঘের প্রথম অখিল ভারতীয় অধিবেশনে ডঃ মুখার্জী বলেন, 'আমি যদি আরও দুজন দীনদয়াল পাই, তবে দেশের মানচিত্র বদলে দিতে পারি।' ১৯৫২ সালে কার্যকর্তাদের সামনে দীনদয়ালজী বলেন, 'অখণ্ড ভারত আলোচনার বিষয় নয়, বহু আলোচনা প্রসূত একটি সঙ্কল্প।'

১৯৬৭ সালে কালীকট অধিবেশনে দীনদয়ালজীকে জনসংঘের সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়। ততদিনে জনসংঘ কয়েকটি প্রান্তের শাসক দলে পরিণত। দীনদয়ালজীর সুযোগ্য নেতৃত্বে যখন দেশ একটি সুস্থ জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক বিকল্প পেতে চলেছে দেশবাসীর মধ্যে এই বিশ্বাস দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হচ্ছিল, সেই সময় ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮ সালে রাত্রে লক্ষ্ণৌ থেকে পাটনার যাত্রাপথে পণ্ডিতজীকে ট্রেনের মধ্যেই হত্যা করা হয়।

দীনদয়ালজীর জন্য রাজনীতি সাধ্য নয়, ছিল সাধনমাত্র। তিনি চাইতেন ভারতীয় মূল্যবোধ আধারিত যুগানুকূল সামাজিক-অর্থনৈতিক রাজনৈতিক রচনা। স্বয়ংসেবকের স্বয়ংসেবকত্ব সম্পর্কে তিনি বলেন, 'আমাদের বাস্তবিক স্বয়ংসেবকত্ব হল আমরা যেন আমাদের মহান ধ্যেয়, মহান লক্ষ্য প্রাপ্তির জন্য সদা সর্বদা প্রযত্নশীল থাকি। আমাদের আদর্শ হল ডাক্তারজী যিনি সভা-সংস্থার মৌসুমী সদস্যদের একদিকে ঠেলে আমাদের প্রকৃত স্বয়ংসেবকত্ব প্রদান করেছেন। তিনি সমাজ ও দেশের জন্য জীবন সমর্পিত কার্যকর্তা তৈরি করেছেন।'

আমাদের হিন্দুত্বই আমাদের স্বয়ংসেবকত্ব। আমরা স্বয়ংসেবক কেবল শাখাতেই নয়, শাখার বাইরেও। যেখানে হিন্দু জড়ো হয়েছে, শুধু সেখানেই আমরা হিন্দু নই, বরং তাদের মধ্যেও আমরা হিন্দু, যারা হিন্দু নয়। আমাদের ব্যবহার এমন হবে, যেন তারা মনে করে হিন্দু এমন তেজস্বী হয়। আমাদের মনে গেঁথে নিতে হবে যে, হিন্দু সংস্কৃতি, হিন্দু পরম্পরা, হিন্দু ধর্ম, হিন্দু জীবন পদ্ধতি ও হিন্দু ব্যবহার সবকটির আমরা প্রতিনিধি।

বর্গ গীত

এসেছে ভারতে নব জাগরণ
পেয়েছে ভারত নূতন প্রাণ
মাতৃমন্ত্রে লয়েছে দীক্ষা
জগতে শিক্ষা করিবে দান।।
স্তম্ভিত করি বিশ্ব মানবে
শিষ্য করিবে জগতখান
পেয়েছে সে আজ পূর্ণ বারতা
শোনরে সকলে পাতিয়া কান। এসেছে ভারতে .....
বিরাট ব্যোমের ছত্র তলে
রবি শশী ঐ তাঁরই আঁখিজলে
ইঙ্গিতে যাঁর ত্রিভুবন টলে
এ মরজগতে তিনি গরীয়ান
অমৃত তিনি শাশ্বত তিনি
তাঁরেই অর্ঘ্য করিব দান।।
এসেছে ভারতে নব জাগরণ.....